১৯১৩-২০১৩ 1913-2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৫ বর্ষ | ১৬তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ ফাল্গুন, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ | ১৭ রবিউস সানি, ১৪৩৪ হিজরি | ২৮ তবলিগ, ১৩৯২ হি. শা. | ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ ঈসাব্দ

সাদ
সত্যের সন্ধানে
A New Live Bangla Discussion Programme

আবারও সত্যের সন্ধানে
২৮ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ টানা ৪ দিন ব্যাপী
টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০
ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭
ই-মেইল ঃ sslive@mta.com

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর জলসা সালানা ২০১৩

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388, 01819-296797, 01817-143100

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Member | REHAB

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

veronica tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com

Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon Since 1983

www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের আরোপিত অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায়

সারাদেশে নজিরবিহীন সহিংসতা শুরু হয়েছে, যা শুধু ইসলামই নয় বরং কোন ধর্মই সমর্থন করে না। এ পর্যন্ত নিহত হয়েছে প্রায় শতাধিক, আহত হয়েছে সহস্রাধিক মানুষ। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়ি-ঘরে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ এমনকি মন্দিরও ভাংচুর করা হয়েছে। শান্তি বিনষ্ট করছে যারা শান্তির ধর্ম ইসলামের অনুপম শিক্ষায় তারা কালিমা লেপন করে চলছে।

সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলাম ধর্মকে মহান আল্লাহ্ তাআলা এ পৃথিবীতে তার প্রিয় নবী, বিশ্ব নবী, সর্ব জাতির নবী এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে শান্তির অমিয়-বাণী দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। বিশ্বনিয়ন্ত্রণকর্তা সব সময়ই মানুষকে শান্তির পথে আহ্বান করে থাকেন। প্রকৃত-শান্তির ধারক ও বাহক ইসলাম ধর্মের নিষ্ঠাবান, শান্তিপ্রিয়-অনুসারী মুসলমানগণ কখনো সমাজের ও দেশের অশান্তির কারণ হতে পারে না। বিশেষ করে যারা ইসলামের নামে দেশ ও জাতিকে পরিচালনা করতে সচেষ্ট তাদের পক্ষে নৈরাজ্য ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা করার কোন সুযোগ নেই। কেননা তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাবীদার

বল প্রয়োগের শিক্ষা ইসলামে নেই। ইসলাম নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করার শিক্ষা দেয় না। ইসলামের শিক্ষা হল– স্বেচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করলে এর প্রতিফল হবে জাহান্নাম। আর আল্লাহ্ তার প্রতি রাগান্বিত আর তিনি তাকে অভিসম্পাত করছেন এবং এক মহা আযাব তার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন' (সূরা আন নিসা: ৯৪)। হত্যার ব্যাপারে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে মোকদ্দমার ফয়সালা করা হবে, তা হবে রক্তপাত অর্থাৎ হত্যা সম্পর্কিত' (বুখারী)। কাউকে হত্যা করাকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে, শুধু নিষেধ করেই ক্ষান্ত হয় নাই, বরং যারা এসব সন্ত্রাসী ও জঙ্গি-কার্যক্রম করে, তাদের শাস্তি কত ভয়াবহ, সে-সম্পর্কেও সতর্ক করা হয়েছে। কোনভাবেই নৈরাজ্য সৃষ্টি করার অনুমতি ইসলাম দেয় না। আর যারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করে তাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির কথা পবিত্র কুরআনে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আজিকার অস্থির এ পরিস্থিতির পেছনে অন্যতম মূল যে কারণটি রয়েছে– তা হলো বিশ্বজুড়ে বিরাজমান অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা। আর এ অবস্থা সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৪র্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ ১৯৯০ সালে তার রচনা Islam's Response to Contemporary Issues-পুস্তকে বলেন– ধার-কর্জ করা টাকা দিয়ে খরচ করার যে দর্শন তা মূলত: এত বেশী বক্র যে, তা থেকে সোজা-সরল সৎ ফলাফল আশা করাটাই একটা পাগলামি।

শিল্প এবং জাতীয় অর্থনীতি যখন শ্বাসরুদ্ধকর পর্যায়ে পৌঁছে যায় দরিদ্র এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে তখন ধনী ও উন্নত দেশগুলোর বিস্ফোরণমুখ পরিস্থিতির তেজস্ক্রিয় কবলে পড়ে ক্রমবর্ধমান বিপদের সম্মুখীন হতে হয়।

বিশাল ঘাটতি বাজেট এবং হাজার হাজার কোটি ডলারের অনাদায়ী ঋণসহ, যুক্তরাষ্ট্র, সামগ্রিকভাবে, ইতোমধ্যেই অতি-ব্যয়ে জর্জরিত হয়ে পড়েছে এবং আমেরিকার জনগণকেও ঋণের ভারী বোঝা বইতে হচ্ছে, ভবিষ্যতে যা তাদেরকে শোধ করতে হবে। এতে করে, সামগ্রিকভাবে, জাতীয় ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাবে, অথবা ঋণদাতা সংস্থাগুলো দেউলিয়া হয়ে যাবে। প্রকৃতির নিয়ম অনিবার্যরূপে কাজ করবে।

আমাদের এই দেশ শান্তিপূর্ণ একটি দেশ। এদেশে বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা সহজ-সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত। যুগ যুগ ধরে শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বসবাস করে আসছে তারা। অশান্তি সৃষ্টি করা হলে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে তা প্রতিহত করতে হবে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকারী বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে বিশৃঙ্খলা করার কোন প্রয়াস ইসলামে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যারা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে তারা শুধু শান্তিকামী মানুষেরই শত্রু নয় বরং তারা মহান আল্লাহ্ তাআলারও শত্রু। ইসলাম আমাদেরকে উশৃঙ্খল জীবন পরিহার করে বিনয়ী এবং বিনম্র হয়ে চলার শিক্ষা দেয়। অতএব, সহজ-সরল জীবন যাপনের পাশাপাশি আমাদের এখন অনেক বেশি দরুদ শরীফ, ইস্তেগফার সম্বলিত দোয়াসমূহ গভীর একাগ্রতার সাথে পাঠে রত থাকা উচিত, যাতে আমরা বিভিষীকাময় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আযাব থেকে রক্ষা পেতে পারি।

সূচিপত্র

২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জার্মানীর হমবুর্গস্থ বাইতুর রশীদ মসজিদে প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** (৭ অক্টোবর ২০১১)	৫
বাংলাদেশ জামা'তের শতবর্ষ পূর্তি মাওলানা মাহমুদ আহমদ, আমীর, আহমদীয়া জামা'ত, অস্ট্রেলিয়া	১১
খেলাফত : বিশ্ব-মুসলিম ঐক্যের একমাত্র পন্থা মুহাম্মদ খলীলুর রহমান	১৬
হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বশীর উদ্দীন আহমদ	১৯
হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) একটি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ স্যার মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান (রাঃ) অনুবাদক: মহিউদ্দিন আহমদ	২৩
হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর শৈশবকালের গুটি কয়েক ঘটনা	২৯
হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) আল মুসলেহুল মাওউদ মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়	৩১
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ছাত্র ভর্তি	৩৪
শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মাহমুদ আহমদ সুমন	৩৫
প্রথম বাঙালি শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	৩৭
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর ৮৯তম সালানা জলসা দোয়া ও কুরবানীর ফলশ্রুতিতে সফলতার সাথে সমাপ্ত	৩৯
সংবাদ	৪১
এমটিএ	৪৪

কুরআন শরীফ

সূরা ইবরাহীম-১৪

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ
الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝٦
وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ
وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ
بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝٧
وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ
كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ۝٨

৬। আর নিশ্চয় আমরা মূসাকেও নিদর্শনাবলীসহ এ আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম, 'তুমি তোমার জাতিকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আন। আর আল্লাহ্‌র দিনগুলো[১৪৫৪] এদের স্মরণ করাও।' নিশ্চয় এতে একান্ত ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে।

৭। আর (স্মরণ কর) মূসা যখন তার জাতিকে বলেছিল, 'তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তিনি ফেরাউনের জাতির কবল থেকে তোমাদের উদ্ধার করেছিলেন। তারা তোমাদের ভয়ানক শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রসন্তানদের হত্যা করতো এবং তোমাদের নারীদের জীবিত রাখতো। এতে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য ছিল এক মহা পরীক্ষা।

৮। আর (স্মরণ কর) তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক যখন ঘোষণা করেছিলেন, তোমরা যদি কৃতজ্ঞ[১৪৫৫] হও তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের আরো দান করবো। কিন্তু তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে (জেনে রেখো) নিশ্চয় আমার আযাব বড়ই কঠোর।'

১৪৫৪। 'আইয়ামুল্লাহ্' আল্লাহ্‌র দিনগুলো অর্থাৎ- আল্লাহ্ তাআলার শাস্তি এবং পুরস্কার (তাজ), যেমন বিখ্যাত আরবী প্রবাদ 'আইয়ামুল আরব', অর্থাৎ- আরবদের লড়াই ও দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধ-বিগ্রহ।

১৪৫৫। 'শোকর অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা। শোকর তিন প্রকার : (১) মন-প্রাণ দ্বারা উপকার বা এহসান প্রাপ্তির পূর্ণ উপলব্ধির স্বীকৃতি, (২) জিহ্বা দ্বারা অর্থাৎ প্রকাশ্য-কথায় উপকারীর উচ্চ-প্রশংসা করা এবং (৩) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা অর্থাৎ উপকার সাধনকারীর উপকার যোগ্যতা অনুসারে পরিশোধ অর্থাৎ বিনিময়ে উপকার করা বিষয়টি পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত : (ক) উপকাকারী ব্যক্তির প্রতি উপকৃত ব্যক্তির বিনয়, (খ) তার প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা, (গ) উপকৃত ব্যক্তি কর্তৃক উপকারকারীর এহসান স্মরণ রাখা ও স্বীকৃতি দেয়া, (ঘ) এর জন্য প্রকাশ্যে তার প্রশংসা করা এবং (ঙ) হিতসাধনকারীর পছন্দনীয় নয় এমনভাবে তার এহসানের ব্যবহার না করা। একেই বলা হয় মানুষের প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা বা শোকর। আর আল্লাহ্ তাআলার প্রতি 'শোকর' প্রকাশের অর্থ তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করা বা প্রশংসা করা, ভাল আদেশ দেয়া, সন্তোষজনক শ্রদ্ধা দেখানো, তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করা, শুভেচ্ছা-সহানুভূতি প্রকাশ করা এবং অনিবার্যরূপে বিনিময় ও প্রতিদান দেয়া (লেইন)। সে-ই প্রকৃত কৃতজ্ঞতাপরায়ণ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ তাআলার দেয়া নেয়ামতের সঠিক ব্যবহার করে থাকে।

হাদীস শরীফ

নামায মানুষকে মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে

কুরআন ঃ

ইন্নাস সালাতা তান্‌হা আনিল ফাহ্‌শায়ে ওয়াল মুন্‌কার

অর্থ ঃ নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। (সূরা আন্‌কাবূত আয়াত ৪৬)।

হাদীস ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.)কে বলতে শুনেছি, তোমরা বলো তো দেখি কারো ঘরের সামনে দিয়ে যদি কোন নদী প্রবাহিত হয় এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার (দেহে) কোন ময়লা থাকতে পারে? সাহাবীগণ (রা.) বললেন, 'না, ময়লা থাকতে পারে না'। তিনি (সা.) বললেন, "পাঁচওয়াক্ত নামাযও তদ্রুপ। আল্লাহ্ তাআলা এ দ্বারা সমস্ত দোষ-ত্রুটি মিটিয়ে ফেলেন"। (বুখারী কিতাব মওয়াক্কিতুস সালাত)।

ব্যাখ্যা ঃ

উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আমাদেরকে পাঁচওয়াক্ত নামাযের তাৎপর্য বর্ণনা করে নামাযের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। খোদা তাআলা বলেন, প্রকৃত নামায মানুষকে অশ্লীল কাজ হতে বিরত রাখে। আর খোদার রসূল (সা.) বলেছেন–প্রকৃত-নামায আদায় করলে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের দোষ-ত্রুটি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেন।

আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূল (সা.) এর এত স্পষ্ট-বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেকেই নামায হতে গাফেল আবার অনেকে এমনও আছে, যারা নামাযও পড়ে ও অশ্লীল অথবা মন্দ কাজেও লিপ্ত থাকে। প্রকৃত নামায আদায়কারী কখনও মন্দকর্মে লিপ্ত হতে পারে না, এটাই খোদার ফয়সালা। এ দিয়ে আমরা আমাদের নামায যাচাই করতে পারি, আমরা সত্যিকার অর্থে নামায পড়ি কি-না? যেভাবে প্রতি দিন পাঁচবার গোসল করলে শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে না, অনুরূপ নিষ্ঠার সাথে পাঁচওয়াক্ত নামায আদায়কারীর হৃদয়েও কোন ধরণের গুনাহ্‌র ছাপ থাকতে পারে না। প্রকৃত নামায সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন যে, নামায এভাবে আদায় করো, যেন তোমরা খোদাকে দেখছো, আর এরূপ না হলে অন্ততঃ এতটুকো ভাবো যে, খোদা তাআলা তোমাকে দেখছেন। আমরা যদি এ ধরণের ধ্যানে মগ্ন হয়ে নামায আদায় করি, তাহলে আমরা প্রকৃত-নামাযী হতে পারবো। নতুবা খোদার ফরমান রয়েছে- অভিসম্পাত ঐ সকল নামাযীদের জন্যে, যারা নামায হতে গাফেল।

আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) জামাতকে বার বার খোদার ইবাদতের দিকে ডাকছেন এবং আহ্বান জানাচ্ছেন, আমরা যেন খোদার যিকিরে রত হয়ে যাই, আর খোদার যিকিরের উত্তম পন্থা হলো নামায যা বিগলিত-চিত্তে খোদার নির্দেশ উপলব্ধি করতঃ আদায় করার মধ্যেই নিহিত। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন সকলে খোদা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর ফরমানের ওপর আমল করে গুনাহ্ হতে মুক্ত হতে পারি। আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

প্রত্যেক পুণ্য কর্মের মূল তাক্‌ওয়া

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

জগদ্বাসী তাদের সম্পদ ও বন্ধু-বান্ধবদের উপর খোদাকে প্রধান্য দেয় না, কিন্তু তোমরা তাঁকে প্রাধান্য দাও, যাতে আকাশে তোমরা তাঁর জামা'তভুক্ত বলে গণ্য হতে পার। রহমতের নিদর্শন দেখানো আদিকাল থেকেই খোদা তাআলার রীতি, কিন্তু তোমরা এই রীতির দ্বারা তখনই উপকৃত হতে পারবে, যখন তাঁর এবং তোমাদের মধ্যে কোন দূরত্ব না থাকে এবং তোমাদের সন্তুষ্টি তাঁর সন্তুষ্টি ও তোমাদের ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছাতে পরিণত হয় এবং প্রত্যেক সফলতা ও বিফলতার সময় তোমাদের মস্তক তাঁর দ্বারে অবনত থাকবে যেন তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হয়। যদি তোমরা এইরূপ কর, তাহলে সেই খোদা তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত হবেন, যিনি দীর্ঘকাল যাবৎ আপন চেহারা লুক্কায়িত রেখেছে। তোমাদের মধ্যে কি কেউ আছে, যে এই উপদেশ মত কার্য করতে ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষী হতে এবং তাঁর কাযা ও কদরে (ফয়সালা ও নিয়তিতে) অসন্তুষ্ট না হতে প্রস্তুত?

অতএব বিপদ দেখলে তোমরা আরও সম্মুখে অগ্রসর হবে, কারণ, এটাই তোমাদের উন্নতির উপায়। তাঁর তৌহীদ জগতে প্রচার করতে নিজেরা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর। তাঁর বান্দাগণের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর ও তাদেরকে নিজ জিহ্বা বা হস্ত দ্বারা বা অন্য কোনও উপায়ে উৎপীড়ন করো না এবং সৃষ্ট জীবের উপকার সাধনে সচেষ্ট থাক। কারোও প্রতি, সে তোমার অধীনস্থ হলেও, অহঙ্কার দেখাবে না এবং কেউ গালি দিলেও তুমি গালি দিও না। বিনয়ী, সহিষ্ণু সদুদ্দেশ্যপরায়ণ ও সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানভূতিশীল হও, যেন খোদা তাআলার নিকট গ্রহণীয় হতে পার। অনেকে এইরূপ আছে, যারা বাহ্যত: সরল, কিন্তু অভ্যন্তরে সর্প-বিশেষ। সুতরাং কেউ কখনো তাঁর নিকট গ্রহণীয় হবে না, যে পর্যন্ত তোমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এক না হয়। বড় হয়ে ছোটকে অবজ্ঞা করবে না, তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। বিদ্বান হলে, বিদ্যাহীনকে আত্মগরিমাবশত: অবমাননা না করে তাকে সুদপদেশ দিবে। ধনী হলে আত্মাভিমানে দরিদ্রের প্রতি গর্ব না করে তাদের সেবা করবে। ধ্বংসের পথ হতে সাবধান থাকবে। সর্বদা আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করবে। কোন সৃষ্ট জীবের উপসনা করবে না। নিজ প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ হও। সংসার হতে মনকে নির্লিপ্ত রাখ এবং তাঁর জন্য সকল প্রকার অপবিত্রতা ও পাপকে ঘৃণা কর; কেননা তিনি পবিত্র। প্রত্যেক প্রভাত যেন সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি তাক্‌ওয়ার সাথে রাত্রি যাপন করেছ এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি ভীতির সাথে দিন অতিবাহিত করেছো।

সুতরাং যে-ব্যক্তি আমার নিকট সত্যিকার বয়আত গ্রহণ করে সরল অন্ত:করণে আমার অনুগামী হয় এবং আমার আনুগত্যে বিলীন হয়ে স্বীয় কামনা-বাসনাকে পরিত্যগ করে, সেই ব্যক্তির জন্যই এই বিপদসঙ্কুল দিনে আমার রূহ শাফায়াত (সুপারিশ) করবে। সুতরাং হে লোক সকল! যারা নিজেকে আমার জামাতভুক্ত বলে গণ্য করে থাক, আকাশে কেবল তখনই তোমরা আমার জামাতভুক্ত বলে পরিগণিত হবে, যখন তোমরা সত্যিকারভাবে তাক্‌ওয়ার (খোদাভীরুতার) পথে অগ্রসর হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায এরূপ ভীতিসহকারে এবং নিবিষ্ট-চিত্তে আদায় করবে, যেন তোমরা আল্লাহ্ তাআলাকে সাক্ষাৎভাবে দেখতেছ। নিজেদের রোযাও তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সাথে পালন করবে। যারা যাকাত দিবার উপযুক্ত, তারা যাকাত দিবে। যাদের জন্য হজ্জ ফরজ হয়েছে এবং তা পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলে তারা হজ্জ করবে, সকল পুণ্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন এবং পাপকে ঘৃণার সাথে বর্জন করবে। নিশ্চয় স্মরণ রেখো যে কোন কর্মই আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না যাতে তাক্‌ওয়া নেই। প্রত্যেক পুণ্য-কর্মের মূল তাক্‌ওয়া।

(কিশতিয়ে নূহ্ পুস্তকের বাংলা সংস্করণের ২২-২৩ ও ২৬-২৭ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত)।

জুমুআর খুতবা

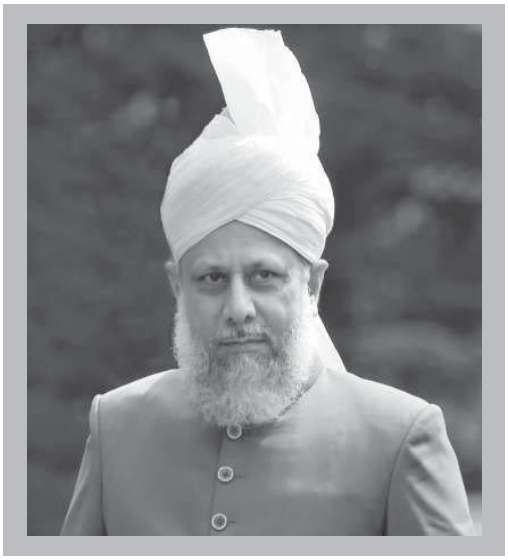

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক জার্মানীর হমবুর্গস্থ বাইতুর রশীদ মসজিদে প্রদত্ত ৭ অক্টোবর ২০১১-এর (৭ ইখা, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরোধিতা এবং আহমদীদের দুঃখ-কষ্ট দেয়া, আজ কোন নতুন বিষয় নয় বা আহমদীয়াতের ইতিহাসে কেবল নিকট অতীতের ব্যাপার নয় বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর পরপরই এই বিরোধিতার ভীত রচিত হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কতক কাছের মানুষ যারা তাঁর সাথে বন্ধুত্বের দাবী রাখত, তাদের দৃষ্টিতে সে যুগে তাঁর মত ইসলাম সেবী আর কেউ জন্মেনি। কিন্তু যখন তাঁর দাবী সম্পর্কে অবহিত হল, যখন তাঁর এই ঘোষণা শুনল যে, আল্লাহ্ তা'লা বারংবার আমাকে বলেছেন, যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের কথা ছিল সে তুমি-ই। এ যুগে বান্দার সাথে খোদার সম্পর্ক স্থাপনকারী আর খোদার প্রিয় তুমি-ই কেননা, আজ খোদার বন্ধু (মহানবী)'র প্রতি ভালবাসায় তোমার চেয়ে অগ্রগামী আর কেউ নেই। তুমিই وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ এর পরিপূরণস্থল। অতএব সেসব মানুষ যারা তাঁকে ইসলামের বিশ্বস্ত ও সত্যিকার সেবক মনে করত; যারা বলত, এ যুগে তাঁর কোন জুড়ি নেই বা তুলনা নেই– কিন্তু দাবীর পর তারাই যে কেবল তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাই নয় বরং তাঁকে দুঃখ-কষ্ট দেয়ার জন্য এমন সব অমুসলমান যারা মহানবী (সা.)-এর অবমাননায় সর্বাগ্রে ছিল তাদের যোগসাজসে এবং তাদের সাথে হাত মিলিয়ে, তাঁর বিরুদ্ধে অন্যায় ও মিথ্যা হত্যা মামলা দায়ের করে। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেও এরা কুণ্ঠা বোধ করেনি।

কাজেই আজ আমরা যে বিরোধিতার সম্মুখীন এটি আহমদীয়া জামাতের জন্য কোন নতুন বিষয় নয়। যেভাবে আমি বলেছি, স্বয়ং তাঁকে [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে] যখন কিনা তাঁর সাথে মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন মানুষ ছিল– এই নিষ্ঠুর বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছে। মামলা-মোকদ্দমাও দায়ের করা হয়। এছাড়া তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর অনুসারীদেরকে পার্থিব ধন-সম্পদ ও উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত হবার মত শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। স্ত্রী-সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মত কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে। এমন কি কাবুলের মাটিতে তাঁর অনুসারীদের মধ্য থেকে দু'জন একনিষ্ঠ সাহাবীকে শহীদ করার মত কষ্টদায়ক ও হৃদয়বিদারক সংবাদও তাঁকে শুনতে হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন খোশ্‌ত (প্রদেশে)'র সবচেয়ে মহান ব্যক্তিত্ব যাঁর নিজের ছিল হাজারো অনুসারী আর রাজ দরবারে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত গণ্য হতেন। এমন বিশ্বস্ত ও ফিরিশ্‌তাতুল্য, পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী অনুসারীদের শহীদ হওয়ার মত মর্মাবিদারক সংবাদ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে।

তিনি এই শহীদের শাহাদতের ঘটনাবলী সম্বলিত একটি বিস্তারিত গ্রন্থ 'তাযকিরাতুশ্ শাহাদাতাঈন' লিখেছেন যাতে তাঁর পুণ্য, খোদাভীতি, আহমদীয়াত গ্রহণ এবং অন্যান্য ঈমানী বিষয়াদীর পাশাপাশি শাহাদতের ঘটনা বিভিন্ন পত্রের আলোকে সংক্ষেপে উল্লেখ করেন যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে তাঁর ভক্তরা লিখেছেন। আর শেষের দিকে তিনি (আ.) উল্লেখ করেন, 'হে আব্দুল লতীফ! তোমার প্রতি সহস্র সহস্র রহমত, কেননা তুমি আমার জীবদ্দশাতেই নিজের বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছো'। আবার একই পুস্তকে তিনি (আ.) আমাদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, 'আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিচ্ছি, এই ধরনের অর্থাৎ হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফের মত ঈমান লাভের জন্য দোয়া করতে থাকুন কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কিছু খোদার জন্য আর কিছু দুনিয়ার জন্য করে ততক্ষণ পর্যন্ত আকাশে তার নাম মু'মিন বলে গণ্য হবে না'।

কাজেই এই দোয়াই প্রত্যেক আহমদীর করা উচিত আর নিজেদের কাজকর্মও তদ্রুপ করার চেষ্টা করতে হবে। আমরা জানি আর নবীদের ইতিহাসও একথাই বলে, তাঁদের ও তাঁদের অনুসারীদের কঠোর পরিস্থিতি ও অসহনীয় অবস্থার মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। এমনকি আমাদের মনিব ও অভিভাবক আর খোদার বন্ধু হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)– যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাঁর জন্যই এই স্বর্গ ও মর্ত সৃষ্টি করেছি, তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদেরও এসব বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট সইতে হয়েছে। অধিকাংশ মানুষই ইতিহাস পাঠ করে আর এ সম্পর্কে জানাও আছে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির পাশাপাশি শত শত মানুষকে প্রাণও হারাতে হয়েছে। অতএব যখনই জামাতের উপর ভয়াবহ পরীক্ষার যুগ আসে তখন নবীদের ইতিহাস বরং সবচেয়ে বেশী মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের

যুগ আমাদেরকে দৃঢ়তা ও অবিচলতার দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে, পাশাপাশি এই দৃঢ় প্রত্যয়ও সৃষ্টি করে যে, এসব বিপদ ও পরীক্ষার যুগ ভবিষ্যত বিজয়ের পথ সুগম করার জন্য এসে থাকে। আমাদেরকে ঈমানে সমৃদ্ধ করার জন্য আসে। খোদার সাথে আমাদের সম্পর্ক দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার লক্ষ্যে আসে। দোয়ার প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করার জন্য আসে। এতে কোন সন্দেহ নেই, সাহাবীগণ (রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহীম) ইসলামের উন্নতির জন্য প্রাণ, ধন-সম্পদ ও সময়ের কুরবানী করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি কিন্তু ইসলামের বিজয় ও সফলতা কেবলমাত্র সেসব পরীক্ষার ফসল নয় বরং সেসব মুসলমানের খোদার সাথে সম্পর্ক; দোয়া করার সময় খোদার সমীপে তাঁদের বিনত হওয়া, এছাড়া বিশ্বনবী মহানবী (সা.)-এর রাতের দোয়া ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আরশকে প্রকম্পিত করতো, খোদার সত্তায় বিলীন সেই নবীর দোয়া, যিনি আপন প্রভুর জন্য সবকিছু উৎসর্গ করেছিলেন– প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র সত্তায় বিলীন সেই রসূলের দোয়াই এমন বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়ভাজনের দোয়ায় অর্জিত ইসলামের এই বিজয় ও সফলতার যুগ কী কেবলমাত্র পঞ্চাশ, ষাট অথবা প্রথম কয়েক শতাব্দী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল? নিশ্চয় নয়। তিনি (সা.) যেহেতু কিয়ামত অবধি খাতামুল আম্বিয়া, কাজেই এই বিজয়ও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর ভাগেই থাকবে। যদিও পথিমধ্যে একটি অমানিশার যুগ এসেছে আর কেটেও গেছে; কিন্তু আখারীনদের মিলিত হওয়ার ফলে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিকের আখারীনদের (পরবর্তীদের) মাঝে প্রেরিত হবার পর ফলে পুনরায় সেই যুগ সূচিত হবার কথা ছিল, যার মাধ্যমে ইসলামের উন্নতির সেই স্বর্ণযুগ চোখে পড়ার কথা যা প্রথম কয়েক শতাব্দীর মুসলমানরা দেখেছিল। যেভাবে আমি বলেছি, সবচেয়ে বেশী প্রথম কয়েক শতাব্দীর মুসলমান, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ আর তাঁদের যুগাবসানে তাবেঈনগণ যারা সাহাবাদের মাধ্যমে কল্যাণমন্ডিত ছিলেন; এরপর তারা যারা তাদের মাধ্যমে আশিস মন্ডিত হয়েছেন। তাদের সবাই সবচেয়ে বেশী নির্ভর করতেন খোদার সত্তায়, নিজেদের চেষ্টা প্রচেষ্টার ওপর নয়। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা দোয়ার প্রতি জোর দিতেন। নিজেদের রাতগুলোকে দোয়ার মাধ্যমে সজ্জিত করতেন। অতএব আখেরীনদের যুগে যেহেতু বিশেষভাবে তরবারীর যুদ্ধ ও জিহাদ রহিত করা হয়েছে তাই দোয়ার গুরুত্ব অপরিসীম আর প্রত্যেক আহমদীকে বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি জ্ঞানের মাধ্যমে জিহাদের যুগ আর যুক্তি-প্রমাণেরও গুরুত্ব রয়েছে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যুক্তি ও প্রমাণে জামাতকে সমৃদ্ধ করেছেন। অধিকন্তু ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষার মোকবিলা আজ বিশ্বের কোন ধর্মই করতে পারে না। তা সত্ত্বেও আসল কথা হল, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা হলে পরেই এই যুক্তি-প্রমাণ কাজে আসতে পারে। আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁর সমীপে বিনত হওয়া এবং যথার্থভাবে দোয়া করা আবশ্যক। এখন আহমদীয়া জামাত অন্যান্য ধর্মের সামনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে যেভাবে বীরদর্পে আগুয়ান আর প্রকাশ্য ও গুপ্ত উভয় বিরোধীর মোকাবিলা করছে, জগদ্বাসীর সামনে মহানবী (সা.)-এর আকর্ষণীয় চেহারা আর তাঁর জীবনের মোহনীয় দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছে। তাঁর ওপর কৃত শত্রুদের আক্রমনের কেবল দাঁতভাঙ্গা উত্তরই দিচ্ছে না বরং তাঁর বিরুদ্ধে যারা আপত্তি করে তাদের আসল চেহারাও তাদের দেখিয়ে দিচ্ছে। পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের উত্তর দিচ্ছে। বরং পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের ওপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করছে। যখন কয়েক বছর পূর্বে ইউরোপে অর্থাৎ জার্মানীতে 'পোপ' ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তি করে– তখন আমি জার্মান জামাতকে বলেছিলাম, এর উত্তর পুস্তকাকারে প্রকাশ করুন। জার্মান জামাত উত্তর দিয়েছে আর অনেকেই এতে অবদান রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের উত্তর লেখা হয়েছে। অন্য কোন মুসলমান ফির্কার এতো বিস্তারিত উত্তর লিখার সৌভাগ্য হয়নি, এমন কি সংক্ষিপ্তও নয়। আমেরিকার যে পাদ্রী ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে হৈচৈ করে থাকে, তার এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অপরাপর আপত্তিকারী ও লিখকদের আপত্তিসমূহের উত্তর দিয়েছে। তাদেরকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসেনি। হল্যান্ড, ডেনর্মাক প্রভৃতি দেশের আপত্তিকারীদের উত্তর দেয়া হয়েছে, আয়নায় দেখিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের আসল রূপ। মোটকথা, আমরা ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহের মোকাবিলা করে যাচ্ছি। কিন্তু একইসাথে স্বজনরাও (মুসলমানরা) আমাদের বিরোধী আর বিরোধিতায় সীমালঙ্ঘন করে চলছে। মুসলমান নাম ধারণ করে, ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সম্মানের নাম ভাঙ্গিয়ে তারা তাঁর (সা.) নিষ্ঠাবান প্রেমিকের প্রতি অন্যায় আক্রমণ করে যাচ্ছে। তাঁর জামাতের ওপর নির্যাতনমূলক ও পাশবিক আক্রমণ করে যাচ্ছে। আর এক্ষেত্রে পাকিস্তানের নাম সর্বস্ব উলামারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) 'তাযকিরাতুশ্ শাহাদাতাঈন' পুস্তকে লিখেছেন, কাবুলের আমীর মৌলভীদের ভয়ে ভীত ছিল আর মৌলভীদের প্ররোচনায় হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফকে শহীদ করা হয়। হয়ত তার (বাদশাহ্‌র) হৃদয়ে তাঁর প্রতি কিছুটা সম্মানবোধ ছিল কিন্তু বাদশাহ্ হওয়া সত্ত্বেও তার লাগাম ছিল মৌলভীদের হাতে। একই অবস্থা আজ পাকিস্তানের সরকার ও জনগণের, তারা সব সময় ভয়ে ত্রস্ত থাকে। তারা সেসব নির্দয় উলামার হাতের পুতুল বনে গেছে। সরকারের অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐ মৌলভীদের মানবতা বিবর্জিত কথাবার্তা মানতে বাধ্য হচ্ছে। মোটকথা, আজ পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদীরা কেবল তাদের প্রাণ ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি নিয়েই উদ্বিগ বা দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত নয় বরং অনেক আহমদী আমাকে লিখেন, এটি এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে গেছে। আমরা চরম ঝুকি নিয়ে চলাফেরা করি আর এটি এখন নৈমিত্তিক ব্যাপার। এ বিষয় আমাদের তেমন কোন ভয় নেই। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি উৎকণ্ঠার কারণ হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-সম্পর্কে এই সকল নিষ্ঠুরদের চরম অশালীন বিজ্ঞাপন প্রকাশ ও বিতরণ। (যত্রতত্র) বড় বড় পোষ্টার লাগায়, আর সরকারী স্থাপনা সমূহে লাগানো হচ্ছে। অশালীন শব্দটি অতি সাধারণ একটি শব্দ, অত্যন্ত নীচ ও জঘন্য শব্দ তারা ব্যবহার করছে যা একজন ভদ্র মানুষের পড়তে এবং শুনতে বাধে। লেখক আরও লিখেছেন, এ শব্দগুলো আমাদের যতটুকু ক্ষতি করছে তার চেয়ে অনেক বেশি আমাদের হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করছে, আমাদেরকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে। এই নোংরা ভাষা মাইকে শুনে আর অশালীন বই-পুস্তক দেখে আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। যখন সরকারী কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তারা তখন হয়তো শুনেও আমাদের কথায় কান দেয় না নতুবা বলে দেয় আমরা অপারগ, আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে। মোটকথা পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদীরা ধৈর্য ও সহনশীলতার এক মহান ও নতুন অধ্যায় রচনা করছে।

কাজেই ধৈর্য ও সহনশীলতার এই চেতনাকে ফলবাহী করার একটিই মাধ্যম তাহলো, খোদার সামনে আমাদের বিনত হওয়া। এত

দোয়া করুন যাতে অশ্রুবারিতে আপনাদের সেজদাস্থল সিক্ত হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'লার আরশকে প্রকম্পিত করার জন্য নিজেদের মাঝে সেই পরিবর্তন আনয়নের প্রয়োজন যা সাহাবীদের (রা.) জন্য বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করেছিল। এদের আঘাত ও মর্মপীড়া থেকে আজ দোয়াই আমাদের রক্ষা করতে পারে। ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর নাম ভাঙ্গিয়ে আহমদীয়াতের প্রতি বিরোধীদের শত্রুতা যত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে অনুপাতে আমাদেরও দোয়ার প্রতি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। বরং তদপেক্ষাও বেশী মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন যেন আমরা দ্রুত আল্লাহ্ তা'লার করুণা আকর্ষণ করতে পারি। পাকিস্তানের আহমদীদের আমি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, শুধু সাধারণ দোয়াই নয় বরং বিশেষ দোয়ার প্রতি পূর্বের চেয়ে অধিক মনোযোগী হোন। বরং এসব দোয়ার পাশাপাশি সপ্তাহে একটি নফল রোযা রাখাও শুরু করুন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী পাকিস্তানী আহমদীরাও পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদী ভাইদের জন্য অনেক বেশি দোয়া করুন। অনুরূপভাবে সমগ্র পৃথিবীর অ-পাকিস্তানী আহমদীরাও পাকিস্তানী আহমদী ভাইদের জন্য অনেক বেশি দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা এসব অত্যাচারীকে অচিরেই নিশ্চিহ্ন করুন যেন শীঘ্র দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট সম্পর্কে মিথ্যা ও নোংরামীর যে বেসাতী চলছে অচিরেই যেন এর অবসান ঘটে আর দেশ রক্ষা পায়; নয়ত দেশ রক্ষার আর কোন নিশ্চয়তা নেই। নিশ্চয় পাকিস্তানী আহমদীদের অ-পাকিস্তানী আহমদীদের দোয়া পাবার অধিকার আছে, কেননা তারাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী আপনাদের কাছে পৌঁছিয়েছে। নিশ্চয় উৎকণ্ঠিত ও উদ্বিগ্ন চিত্তে যেসব দোয়া করা হয় তা খোদা তা'লা শোনেন। আজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে যে চরম প্রগলভতা চলছে, এর তুলনায় এমন আর কোন্ বিষয় আছে যা আমাদের অধিক ব্যাকুল করবে? অতএব আজ সব আহমদীর আকুল হয়ে দোয়া করা প্রয়োজন। কেননা উদ্বিগ্ন চিত্তের দোয়া আল্লাহ্ তা'লা কখনো প্রত্যাখ্যান করেন না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে একস্থানে বলেন, 'পবিত্র কুরআনের একস্থানে খোদা তা'লা নিজ পরিচয়ের এ চিহ্ন বর্ণনা করেন, তোমাদের খোদা সেই খোদা! যিনি ব্যাকুলতার আতিসহ্যে কৃত দোয়া গ্রহণ করেন। যেমন তিনি বলেন,

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

(সূরা আন্ নাহল:৬৩)। এরপর বলেন, 'স্মরণ রেখো! খোদা তা'লা পরবিমুখ। যতক্ষণ পর্যন্ত অধিকহারে ও বারংবার উৎকণ্ঠার সাথে দোয়া করা না হয়, তিনি ভ্রুক্ষেপ করেন না। দেখো, কারো স্ত্রী বা সন্তান অসুস্থ হলে বা কারো বিরুদ্ধে কোন গুরুতর মোকদ্দমা দায়ের হলে সে কত ব্যাকুল হয়ে যায়। কাজেই দোয়াতেও যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার ব্যাকুলতা ও উদ্বিগ্নতা সৃষ্টি না হয়, ততক্ষণ তা সম্পূর্ণ প্রভাবহীন ও বৃথা কাজ। দোয়া গৃহীত হবার জন্য ব্যাকুলতা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

অতএব আজ প্রত্যেক আহমদীকে ব্যাকুল হয়ে বিশেষভাবে এসব দোয়া করা প্রয়োজন। বিশেষভাবে পাকিস্তানী আহমদীদেরকে পাকিস্তানের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য জোরালোভাবে এসব দোয়া করা প্রয়োজন। যেমন আমি বলেছি, পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদীরা কোন কোন স্থানে এই উদ্বেগও প্রকাশ করছেন, সব আহমদী নয় বরং কতিপয় আহমদী এমন ভাবাবেগ প্রকাশ করছেন। এর বহিঃপ্রকাশ আরো অধিক হওয়া প্রয়োজন । প্রত্যেক আহমদী বিশুদ্ধচিত্তে অত্যাচারী ও অত্যাচার থেকে মুক্তির লক্ষ্যে দোয়া করুন। এটিই আমাদের অস্ত্র এবং এর প্রতিই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারংবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আমার স্মরণ আছে চতুর্থ খিলাফতের যুগে আমি যখন রাবওয়াতে ছিলাম, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আমাকে নাযেরে আলা নিযুক্ত করেছিলেন। আমি পাকিস্তানের অবস্থার জন্য দোয়া করেছি, অথচ আজকের পরিস্থিতি যত ভয়াবহ তখন এর এক দশমাংশও ছিল না, এর কোন তুলনাই হয় না। তখন স্বপ্নে আমি এই শব্দ শুনতে পাই, 'যদি পাকিস্তানের শতভাগ আহমদী একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হয় তাহলে কয়েক রাতের দোয়াতেই এই অবস্থার অবসান সম্ভব'। আমি প্রথম দিন থেকেই জামাতের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছি, আপনারা আত্মসংশোধন ও দোয়ার প্রতি মনোযোগ দিন। নিজের অজান্তেই আমার প্রতিটি বক্তব্য এ বিষয়ে পর্যবসিত হয়। এটি নিশ্চিত, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত খোদা তা'লার বিজয়ের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে, ইনশাআল্লাহ্। পূর্ণ হবে নয় বরং এ প্রতিশ্রুত পূর্ণ হচ্ছে। পাকিস্তানে জামাতের সদস্যদের দোয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া আবশ্যক। বিজয়ের সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার দৃশ্য বা দৃষ্টান্ত পাকিস্তানেও আমরা দেখছি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও জামাত সেখানে ক্রমশ উন্নতি করছে। শত্রুর সকল ষড়যন্ত্র, প্রত্যেক আক্রমন যে ভয়াবহ উদ্দেশ্যে করা হয় আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে শত্রুকে সে অনুপাতে সফলতা দেন না। শত্রুর পরিকল্পনা অত্যন্ত ভয়ানক কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কেবল স্বীয় অনুগ্রহেই তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের সুরক্ষা বিধান করে যাচ্ছেন। কিন্তু এ সমস্ত পরীক্ষা দেখে আমাদের উচিত এক দুর্বার আকর্ষণ নিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। আমাদের প্রত্যেক আবালবৃদ্ধবনিতাকে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ঝেড়ে ফেলে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর সামনে সম্পূর্ণ বিনত হয়ে (হুকুকুল্লাহ্ ও হুকুকুল ইবাদ) আল্লাহ্ ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের আপ্রাণ চেষ্টা করে যদি আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সমর্পিত হয় তাহলে এই অত্যাচারী ও অত্যাচার দেখতে দেখতে উবে যাবে, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ চাইলে অবশ্যই তাঁর তকদীর জয়যুক্ত হবে। কিন্তু সেই তকদীর শীঘ্র বা বিলম্বে প্রকাশিত হওয়া কখনও কখনও বান্দার কর্ম বা দোয়ার সাথে শর্তসাপেক্ষ হয়ে থাকে। কখনও কখনও একটি প্রজন্মকে অপেক্ষা করতে হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি এ কাজ অবশ্যই করবো; কিন্তু যদি তোমাদের তাড়া থাকে তাহলে আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি তা পূর্ণ করার জন্য নিজেদের জীবনে এক বিপ্লব সাধন কর এবং নিজ আচরণে এক পরিবর্তন আনয়ন কর। খোদা তা'লার বাণীকে বুঝা উচিত। অতএব আসুন! আজ নিজেদের দোয়া দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার আরশ কাঁপিয়ে তুলুন। আরশকে প্রকম্পিত করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লার রহমত যা আমাদের জন্য উদ্বেলিত একে আরো অধিক উদ্বেলিত করতে হলে আমাদের প্রত্যেকের একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর সমীপে ঝুঁকা উচিত যেন তিনি আমাদেরকে অত্যাচারীদের হাত থেকে মুক্তি দেন। শতভাগের মাঝে এই বিপ্লব সৃষ্টি না হলেও যদি আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভেতর এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসে যায় তাহলে আমরা পূর্বের তুলনায় অধিক বিজয়-দৃশ্য অবলোকন করতে পারবো।

আল্লাহ্‌র কাছে আমার আকুতি থাকবে, আমরা যেন দোয়ার প্রকৃত মর্ম বুঝি আর দোয়া করার

রীতি সম্পর্কে সচেতন থাকি যেন তা খোদা তা'লার কৃপা শীঘ্র আকর্ষণ করতে পারে। এই ধারণা বা চিন্তা আমাদের হৃদয়ে যেন কখনো না আসে, আমরা এত দোয়া করছি এরপরও আল্লাহ্ তা'লা তা কবুল করছেন না বা সেই দৃশ্য আমাদের দেখাচ্ছেন না। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'লা দোয়া কবুল করে যাচ্ছেন এমনকি আমাদের তুচ্ছ দোয়া ও প্রচেষ্টায় স্বীয় বিশেষ কৃপায় এত ফল দিচ্ছেন যা দেখে বিস্মিত হতে হয় এবং খোদা তা'লার অস্তিত্বে ঈমান দৃঢ় হয়। আমি যেমন বলেছি, পাকিস্তানে শত্রুদের ষড়যন্ত্র যত ভয়ানক আর প্রতিদিন যেভাবে ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে সে তুলনায় তাদের সফলতা কিছুই না। এছাড়া পাকিস্তানেও আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় আহমদীয়া জামাত ঈমানে উন্নতি করছে আর আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপাবারি তারা অবলোকন করছে। আর যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা জগতের সামনে জামাতকে পরিচিত করাচ্ছেন এবং উন্নতি দিচ্ছেন এটিও আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ এবং আমাদের নগণ্য প্রচেষ্টা এবং সামান্য দোয়ার প্রতিফল। দ্বিতীয় কথা হল, যদি কারো মনে সামান্যমত সন্দেহও থেকে থাকে যে, আমাদের দোয়া আল্লাহ্ তা'লা শোনেন না তবে তার ইস্তেগফার করা উচিত আর স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা মালিক বা সর্বাধিপতি আর আমাদের কাজ কেবল মালিকের কাছে যাচনা করা। এরও কিছু নিয়ম-নীতি আছে যা আমাদের পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হবে। আর এ নিয়ম-কানুনের অনুবর্তীতা করাই হল আমাদের কাজ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দোয়ার নিয়ম-নীতি সম্পর্কে বিশেষভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, দোয়া করার বেলায় কখনো ক্লান্ত হয়ে নিরাশ হলে চলবে না আর আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে কখনো এ কুধারণা পোষণ করা উচিত নয় যে, তিনি দোয়া শোনেন না। প্রথম কথা হল, দোয়া প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে গৃহীত হওয়ার জন্য একটা সময়ের দাবী রাখে, দ্বিতীয়তঃ দোয়া সেভাবে গৃহীত নাও হতে পারে যেভাবে চাওয়া হয়। বরং আল্লাহ্ তা'লা অন্য কোনভাবে নিজ প্রিয়দের দোয়া গৃহীত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ করে থাকেন। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, গোটা বিশ্বে জামাতের উন্নতির ক্ষেত্রে পাকিস্তানের কুরবানী, পাকিস্তানী আহমদীদের ত্যাগ এবং দোয়ার অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। তৃতীয়তঃ বান্দাকে নিজের অবস্থারও পর্যালোচনা করতে হবে, সে পবিত্র মনে খোদা তা'লার অধিকারসমূহ প্রদান করতঃ নিজ মস্তক খোদা তা'লার দরবারে অবনত করেছে কী? যদি চিন্তা করে দেখেন তবে বুঝতে পারবেন, দোষ বান্দারই (খোদা তা'লার নয়)। অপর এক জায়গায় দোয়ার নিয়ম-নীতির উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

'খোদা তা'লার কাছে দোয়া করার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-নীতি মানতে হয়, আর কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাদশাহ্‌র কাছে কিছু চাইতে গিয়ে সর্বদা শিষ্ঠাচারের ব্যাপারে যত্নবান থাকে। কীভাবে যাচনা করতে হয়, সূরা ফাতিহাতে খোদা তা'লা তা-ই শিখিয়েছেন আর তিনি শিখিয়েছেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার যিনি জগতসমূহের প্রভু-প্রতিপালক। الرَّحْمَنِ অর্থাৎ যিনি অযাচিত দানকারী। الرَّحِيمِ অর্থাৎ যিনি মানুষের সত্যিকার পরিশ্রমের উত্তম ফল প্রদান করেন। مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ প্রতিদান-শাস্তি তাঁর হাতেই নিহিত। তিনি ইচ্ছে হয় রাখেন আর ইচ্ছে হয় মারেন'। তিনি (আ.) বলেন, 'এ জগত এবং পরকালের শাস্তি ও প্রতিদান উভয় তাঁরই করায়ত্বে'। তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, 'মানুষ যদি এভাবে খোদা তা'লার প্রশংসা করে তাহলে সে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে যে, তিনি কত মহান স্রষ্টা যিনি রব্ব, রহমান, রহীম আর তাঁকে অদৃশ্যেও বিশ্বাস করে এসেছে। অর্থাৎ এসব দোয়া যখন করে তখন আল্লাহ্ তা'লার সেসব গুণাবলীর প্রতিও বিশ্বাস রাখে এবং ধীরে ধীরে তা এতটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, সে খোদা তা'লাকে সামনে উপস্থিত ও সর্বদ্রষ্টা জ্ঞান করে ডাকে এবং বলে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ অর্থাৎ এমন পথ যা একেবারেই সোজা, যাতে কোনরূপ বক্রতা নেই। একটি পথ অন্ধদের হয়ে থাকে, তারা অনর্থক পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয় ঠিকই কিন্তু কোন ফল লাভ হয় না। এবং অপর পথ এমন– যে পথে পরিশ্রম করলে উত্তম ফলাফল সৃষ্টি হয়। এর পর صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ ঐসব লোকদের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ এবং সেটিই সিরাতাল মুস্তাকিম, যে পথে চলার ফলে পুরস্কার লাভ হয়। এরপর, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ না ঐ লোকদের পথে যাদের ওপর তোমার শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছে এবং وَلَا الضَّالِّينَ এবং (তাদের পথেও নয়) যারা (সোজা পথ থেকে) দূরে পড়ে রয়েছে'।

কাজেই দোয়ার রীতি-নীতিও আমাদের কিছুটা জানা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার মৌলিক গুণাবলীসমূহ যথা: রব্ব, রহমান, রহীম, মালিকিইয়াওমিদ্দীন এগুলোর ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন বাঞ্ছনীয় এবং যখন এসব গুণাবলীর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান নিশ্চিত হবে তখনই ইবাদত ও দোয়ার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে আর বান্দা বিনয়ের সাথে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বিশেষ বান্দাদের যেসব দানে ভূষিত করেন সেসব পুরস্কার লাভের অভিপ্রায়ে তারা তাঁকে ডাকে। আমার কোন কথা ও কাজ যেন আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির কারণ না হয় এ ভয় থাকা উচিত। সব সময় আল্লাহ্‌র ভয় যেন হৃদয়ে বিরাজমান থাকে। একজন বিনয়ী বান্দা সর্বদা এ চেষ্টায় রত থাকে, আমি যেন কখনোই স্বীয় খোদা থেকে দূরে সরে না যাই। এমন সময় যেন কখনও না আসে যখন আমি খোদাকে বিস্মৃত হবো। অতএব পরিস্থিতি এমন হলে দোয়া কবুল হয় এবং পুরস্কার নাগালের ভেতর এসে যায়। বিজয়ের লক্ষণাবলী প্রদর্শন করা হয় আর শত্রুদের ধ্বংস ও বিনাশ তখন কেবল সময়ের ব্যাপার হয়ে থাকে মাত্র।

তাই যেভাবে আমি বলেছি, চলুন এখন পূর্বের তুলনায় আমরা নিজেদের ঈমানকে অধিক দৃঢ় করি, নিষ্ঠার সাথে তাঁর সামনে বিনত হই। আমাদের শত্রুরা যদি (বিরোধিতার ক্ষেত্রে) চরম পর্যায়ে পৌঁছে– তাহলে চলুন! আমরাও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এ পংক্তি 'আমরা আমাদের পরম বন্ধুর মাঝে আত্মগোপন করলাম' এর পরিপূরণস্থল হবার চেষ্টা করি।

নিশ্চয় আমরা যখন আমাদের খোদার মাঝে বিলীন হয়ে তাঁর নিকট যাচনা করব তিনি ছুটে আসবেন আর আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ধ্বংস এবং নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনকারী একজন বান্দা যদি রাজ দরবারীদেরকে রাতের তীর দ্বারা, রাতের সেই দোয়া সমূহের মাধ্যমে যা আরশকে কাঁপিয়ে দিতে পারে, পরাজিত করতে পারে তাদেরকে পদানত করতে পারে এবং সেই পারিষদদের এটি বলতে বাধ্য করতে পারে, 'আমরা তীর সমূহের মোকাবিলা করতে পারব না' তাহলে নিশ্চয় আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুসারী, আল্লাহ্ তা'লা যাদেরকে এ শুসংবাদ দিয়েছেন, 'আমি তোমার এবং তোমার প্রিয়দের সাথে আছি', (তাই) আমরাও যদি দোয়া করি আর রাতের তীরের মাধ্যমে শত্রুর মোকাবিলা করি তাহলে অবশ্যই আমরা সফল হবো। তবে সম্ভবত সেই পারিষদদের মাঝে পুণ্যের কোন ছাপ অবশিষ্ট ছিল যে কারণে তারা ঐ বুযুর্গকে রাতের তীরের ভয়ে বিরক্ত করা ছেড়ে

দিয়েছিল। আর নিজেদের জায়গা পরিবর্তন করে নিয়েছিল, গান-বাজনা ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ ঐ সকল লোক যারা মৌলভী, ওলামা আখ্যায়িত হচ্ছে, সেই রসূল (সা.) যিনি রহ্‌মাতুল্লিল আলামীন ছিলেন, তাঁর নামে যারা নির্যাতনের বাজার গরম করে রেখেছে তাদের ভেতর পুণ্যের লেশমাত্রও নেই। তাদের না খোদায় বিশ্বাস আছে না-ই রসূলের প্রতি। তাদের কাছ থেকে কোন প্রকার কল্যাণ আশা করা যায় না। এখন মনে হয় তাদের ভাগ্যে কেবল ধ্বংসই নির্ধারিত আছে যা কেবল আমাদের রাতের তীরের মাধ্যমে হতে পারে। যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি, আমরা সেই মোহাম্মদী মসীহ্‌র দাস, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, 'আমি তোমার ও তোমার প্রিয়দের সাথে আছি'। কাজেই আমরা যদি আমাদের প্রিয় খোদাকে নিষ্ঠার সাথে ডাকি, রাতের গভীরে শত্রুর বিরুদ্ধে তীর চালাই, তাহলে নিশ্চয় খোদা আপন কুদরতের বিশেষ নিদর্শন প্রদর্শন করবেন।

অতএব দোয়া এমন একটি অস্ত্র! যদি কেউ একে পূর্ণ বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সাথে ব্যবহার করে তাহলে কেউ এর সামনে দাঁড়াতে পারবে না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খোদা তা'লার প্রেরিত মহাপুরুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেই মহান অস্তিত্ব যিনি এ যুগে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর দাসত্বে বান্দাদেরকে খোদার সাথে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করতে এসেছিলেন। তাই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তাঁর সাথে আল্লাহ্ তা'লার যেসব প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেগুলি পূর্ণ হবে আর অবশ্যই পূর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ্। কেননা খোদা তা'লার আপন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার ব্যাপারে আমাদের (নাউযুবিল্লাহ্) সামান্যতম সন্দেহও নেই। তিনি নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন, অবশ্যই করেন, কারণ তিনিই হলেন সত্য প্রতিশ্রুতি দাতা। আমি যেভাবে বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর পর থেকে এ পর্যন্ত বিরোধিতার ঝড় বয়ে চলেছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র যুগে আহরারীরা কাদিয়ানকে ধুলিসাৎ করার বড় বড় বুলি আওড়েছিল। এরপর এক ব্যক্তি ক্ষমতার নেশায় মত্ত হয়ে আহমদীদের হাতে ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়ে দেবার দাবী করেছিল। আরেকজন আহমদীয়াতকে ক্যানসার আখ্যা দিয়ে সমূলে উৎপাটন করার শপথ নিয়েছিল। কিন্তু এসব কিছুর পরিণাম কি হলো? আজ আহমদীয়াত পৃথিবীর দু'শতাধিক দেশে বিস্তার লাভ করেছে। কাজেই এ জামাত খোদা তা'লার প্রিয় জামাত। যিনি তাঁর প্রিয়জনকে এ যুগে ইসলামরূপী বাগানে পানি সিঞ্চনের জন্য পাঠিয়ে এ জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন আর আমরা প্রতিক্ষণ ও প্রতিনিয়ত খোদা তা'লার সমর্থন ও সাহায্য প্রত্যক্ষ করছি। তাই এটি চিন্তার বিষয় নয় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত কি না? অথবা নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ্ তা'লা নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করছেন না? বরং চিন্তার বিষয় হলো, আমরা নিজ দায়িত্ব উত্তমভাবে পালন করছি কিনা? দোয়ার প্রতি মনোনিবেশ করছি কিনা? আমরা দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র প্রতি ঝুঁকেছি কিনা? আমরা খোদার সমীপে বিনয়ের সাথে সমর্পিত হই কিনা? অতএব এখন আমাদের কাজ হলো, স্ব-স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে অন্যায়ভাবে আরোপিত কষ্টদায়ক কথা শুনে শুধু আক্ষেপ বা উৎকণ্ঠার বহিঃপ্রকাশই যথেষ্ট নয় বরং রাতের দোয়া (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামাযের দোয়া) দ্বারা ঐশী তকদীরকে (অর্থাৎ বিজয়) অচিরেই নিজেদের অনুকূলে আনার ব্যাপারে সচেষ্ট হোন। এককভাবে এবং সমষ্টিগত ভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এমন দোয়া করার তৌফিক দান করুন যা তাঁর দয়া ও কৃপাকে আকর্ষণ করবে আর আমরা যেন খোদার আরশকে প্রকম্পিত করার মত দোয়া করতে পারি। যার ফলে খোদা তাঁর সৈন্যবাহিনী ও ফিরিশ্‌তাদের নির্দেশ দিবেন, তোমরা যাও এবং গিয়ে নির্যাতিতদের সাহায্য কর। আল্লাহ্ যেন ফিরিশ্‌তাদের এ নির্দেশ দেন, যারা 'রাব্বী ইন্নি মাগলুবুন ফানতাসির' (অর্থাৎ হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি পরাভূত কাজেই তুমি আমাকে সাহায্য কর) বলে দোয়া করছে তোমরা তাদের শত্রুদের 'ফাসাহ্‌হিকহুম তাসহীকা' তোমরা তাদেরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দাও। তোমরা যাও এবং এসব নির্যাতিত ও অসহায়দের সাহায্য কর; যাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যার দম্ভে নির্যাতনের লক্ষস্থলে পরিণত করছে। শাসক যাদেরকে অত্যাচার মূলক বিধানের অধীনে সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে, যাদেরকে ধর্মের তথাকথিত ঠিকাদাররা ইসলামের নামে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার দাবী করছে– যাদের দোষ শুধু এটুকুই, এরা আমার প্রেরিতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই ঘোষণা করছে, আমরা আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি এবং ঈমান এনেছি। কাজেই হে ফিরিশ্‌তাগণ! যাও এদের সাহায্য কর। পৃথিবীবাসীকে বলে দাও এরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছে। অতএব আমি তাদের অভিভাবক, সুরক্ষক ও সাহায্যকারী। আমার এ কথা আজও সত্য فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ অর্থাৎ তিনি কতই উত্তম অভিভাবক এবং কতই উত্তম সাহায্যকারী। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাদের সাথে যারা সংঘর্ষে লিপ্ত হবে তারা আমা কর্তৃক ধৃত হবে। অতএব খোদা তা'লার এ স্নেহ সুলভ ব্যবহার লাভের জন্য প্রত্যেক আহমদীর উচিত খোদা তা'লার সামনে বিনত হওয়া, দোয়া করা, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদার আরশ হতে আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আদেশ জারী না হয়ে যায়। আমরা অনেক দুর্বল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এরা যেসব অশোভন শব্দ ব্যবহার করে থাকে আমরা এর প্রতিশোধ নিতে অপরাগ। এর চিকিৎসা শুধু একটিই আর তা হলো, নিজেদের সিজদার স্থানকে চোখের অশ্রুতে সিক্ত করুন। স্বীয় অভিভাবক, অসহায়দের সাহায্যকারী এবং নির্যাতিতদের সমর্থনকারীকে ডাকুন। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর খোদাকে ডাকুন যিনি দুর্বল ও নিঃস্ব মুসলমানদের পরাধীন অবস্থা থেকে শাসকের আসনে বসিয়েছেন। যিনি শত্রুর প্রত্যেক ষড়যন্ত্র তাদের মুখে ছুড়ে মেরেছেন।

অতএব হে খোদা! আজ আমরা তোমার করুণা ও প্রতাপের দোহাই দিয়ে দোয়া করছি, এ দেশের মাটিকে তোমার রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর অনুসারী হবার দাবীকারকরা তাদের ব্যক্তিস্বার্থ এবং অহংকারের বশবর্তী হয়ে তোমার অনুগত দাসদের জন্য খুবই সংকীর্ণ করে দিয়েছে; এরা একে আমাদের জন্য কন্টকাকীর্ণ জঙ্গলে পরিণত করার চেষ্টা করছে। হে খোদা! তুমি তোমার বিশেষ কৃপাগুণে আমাদের জন্য এ দেশকে জান্নাত বানিয়ে দাও। আমাদের জন্য এ স্থানকে ফুলের বাগান বানিয়ে দাও। আমাদেরকে তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগামী কর। তোমার সাথে সাক্ষাতের এক অফুরাণ ধারার সূচনা কর। তুমি আমাদের এসব দোয়া কবুল কর। তুমি আমাদেরকে এবং উম্মতে মুসলেমার সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীকে নামধারী আলেমদের নৃশংস থাবা থেকে মুক্ত করে তোমার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিক [ইমাম মাহদী (আ.)]-এর জামাতভূক্ত হবার সুযোগ দান কর। যেন উম্মতে মুসলেমা 'খায়রে উম্মত' তথা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হবার কর্তব্য পালন করতঃ এ পৃথিবীকে যুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে পারে। হে পরম দয়াময় খোদা! তুমি আমাদের প্রতি কৃপা করতঃ আমাদেরকে এই সৌভাগ্য দান কর।

আজও একটি দুঃসংবাদ আছে। পাকিস্তানের ঐ অত্যাচারীদের নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু হয়েছেন আরেকজন আহমদী। কয়েকদিন পূর্বে মুহম্মদ শরীফ সাহেবের সন্তান শেখুপুরা নিবাসী মাস্টার রানা দেলাওয়ার হোসেন সাহেবকে হত্যা করা হয়েছে। মাস্টার দেলাওয়ার হোসেন সাহেব ১৯৬৯ সালের ২৫শে মে শেখপুরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ গ্রামে প্রাথমিক

শিক্ষা অর্জন করেন। পরে বি.এ পাশ করে শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ নেন এবং বি.এড পাশ করেন। ১লা অক্টোবর ২০১১, রোজ শনিবার দুপুর সাড়ে বারটার সময় কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি স্কুলের শ্রেণীকক্ষে ঢুকে যখন তিনি পাঠদান করছিলেন, তাঁর উপর গুলি চালায়। একটি গুলি তাঁর ঘাড়ে আরেকটি পেটে লাগে এরফলে তিনি শাহাদত বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ আহত অবস্থায় স্কুলেই তাঁর অবস্থা আশংকাজনক ছিল। হাসপাতালে নেয়ার পথে তিনি শাহাদত করণ করেন। তিনি নবদীক্ষিত আহমদী ছিলেন। প্রকৃতিগতভাবেই তিনি ধর্মীয় বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ রাখতেন, সত্য সন্ধানী ও অনুসন্ধিৎসুমনা ছিলেন। আলেমদের সাথে মতবিনিময় করতেন, পড়াশুনার অভ্যাস ছিল। বিভিন্ন ইসলামী ফির্কা সম্পর্কে গবেষণা তাঁর নিত্যদিনের অভ্যাস ছিল। প্রকৃতিগতভাবে পুণ্য ও ব্যক্তিগত গবেষণার সুবাদে সেসব বিদ'আত যা আজকালের আলেমরা প্রচলন করে রেখেছে যেমন কুলখানী, তাবীজ-কবজ ইত্যাদি এর প্রতি তিনি ঘৃণা পোষণ করতেন আর আত্মীয়-স্বজনদের বলতেন, এসব থেকে বিরত থাক কেননা এগুলো বৃথা কার্যকলাপ। আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমেই তিনি আহমদীয়াতের সংবাদ পেয়েছিলেন। গবেষণার উদ্দেশ্যে একাধিকবার আত্মীয়-স্বজনের সাথে রাবওয়াহ্ গিয়েছেন, জামাতের পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তক পড়তেন।

এমটিএ-এর অনুষ্ঠান দেখতেন। সে সময় একজন সুপরিচিত আহমদীর সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়, তিনি তার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন আর এর কিছুদিন পর তিনি বয়'আত করেন। যখন তিনি প্রথমে বয়'আত করতে চাইলেন তখন তাকে বলা হয়েছিল, আরো যাচাই বাছাই করুন। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, আমার বয়'আত নিয়ে নিন, না জানি কখন মৃত্যু এসে যায়। আমি জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করতে চাই না কাজেই আমার বয়'আত গ্রহণ করুন।

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখে তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। বয়'আতের পর অল্প সময়ের মধ্যেই অসাধারণ চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। নামাযে গভীর মনোযোগের পাশাপাশি প্রতিদিন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন। সন্তানদেরকেও তা নিয়মিত করার উপদেশ দিতেন। বাড়ীতে নিয়মিত বাজামাত নামায পড়ার ব্যবস্থা করতেন। খিলাফতের প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল। বয়'আতের পরপরই বাড়ীতে এমটিএ'র সংযোগ নেন। তিনি শুধু নিজেই (এমটিএ) দেখতেন না বরং ছেলেমেয়েদের সাথে বসিয়ে দেখাতেন। এমটিএ'র অধিকাংশ অনুষ্ঠানই তিনি দেখতেন। একান্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে তিনি তবলীগের কাজ করতেন। তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও সহকর্মী শিক্ষকদের কাছে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছে দিতেন এবং স্থানীয় মুরব্বী সাহেবের সাথে রীতিমতো যোগাযোগ করাতেন। এছাড়াও তিনি তাদের কাছে এমটিএ (থেকে ধারণকৃত বিভিন্ন) জামাতী সি.ডি, বইপত্র ও পত্রিকা পৌঁছে দিতেন। আর নিজেও বিভিন্ন বই পড়তেন। এক মুরব্বী সাহেব আমাকে লিখেছেন, তবলীগের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অকুতোভয় বা অত্যন্ত নির্ভিক। একইভাবে খিলাফতের সাথে তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম শুনলে বা ছবি দেখলে তাঁর চোখে গভীর ভালবাসা ও সম্মান ফুটে উঠত। মুরব্বী, মুয়াল্লেম ও জামাতের কর্মকর্তাদের সাথে তিনি অসাধারণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখতেন। আতিথেয়তার বৈশিষ্ট্যটি তাঁর মাঝে প্রবল ছিল। তিনি রীতিমত জুমুআর নামায পড়তে যেতেন এবং ছেলেমেয়েদেরও সাথে নিয়ে যেতেন। সন্তানদের শিক্ষা- দীক্ষার ব্যাপারে তিনি চিন্তিত থাকতেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল, ছোট ছেলেটি জামাতের মুরব্বী হবে। সব ধরনের আত্মত্যাগের জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। বয়'আতের পরপরই তিনি জামাতের চাঁদার সাথে যুক্ত হয়ে যান। বয়'আতের পর তাঁকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তাঁকে এক ঘরে করে রাখে। কিন্তু এক ঘরে থাকার পরও তাঁর ঈমান দৃঢ় হতে থাকে। শেষে তাঁর পরিবারের লোকজন তাঁর সাথে কতক মৌলভীর ধর্মীয় বিতর্কও করায়। কিন্তু মৌলভীদের কাছে কোন যুক্তি-প্রমাণ না থাকার কারণে তারা ব্যর্থ হতো। মৌলভীরা তাঁর বাড়ির সামনে একটি সভা করে আর তিনি একাই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। মৌলভীরা যখন তাঁর সাথে যুক্তিতর্কে পেরে উঠছিল না তখন তাঁর বিরুদ্ধে কাফির ও ওয়াজিবুল কতলের (হত্যাযোগ্য) ফতওয়া দেয়া শুরু করে। তথাপি তিনি নির্ভয়ে সেই জলসায় উপস্থিত থাকেন এবং মৌলভীদের সাথে যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে কথা বলার চেষ্টা করেন কিন্তু মৌলভীদের কাছে কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই তাই তারা শেষ পর্যন্ত গালাগালি করে সেখান থেকে প্রস্থান করে।

তিনি পূর্বেও একটি বিয়ে করেছিলেন কিন্তু সেই স্ত্রী মারা যান। পরে ১৯৯৩ সনে প্রথম স্ত্রীর ছোট বোনকে বিয়ে করেন এবং এই স্ত্রীর গর্ভে দুই ছেলে ও দুই মেয়ের জন্ম হয়, তাদের বয়স যথাক্রমে ১৭, ১৫, ৯ ও ৫ বছর।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নিত করুন। তাঁর স্ত্রী-সন্তানদেরকে দৃঢ়তা দান করুন, ঈমানের উন্নতি দিন এবং তাদের রক্ষক ও সাহায্যকারী হোন। তাদেরকে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন। জুমুআর নামাযের পর তার গায়েবানা জানাযা পড়াব ইনশাআল্লাহ্।

আরেকটি জানাযা গায়েব রয়েছে, এটি আমাদের ফযলে উমর হাসপাতালের অনেক প্রবীণ কর্মী আব্দুল জব্বার সাহেবের। তার পিতার নাম জনাব ফযল দ্বীন। গত ৪ঠা অক্টোবর সকাল ৮টায় তিনি পরলোকগমন করেন। তিনি অনেক দিন যাবত অসুস্থ ছিলেন। তিনি হৃদরোগী ছিলেন আর চিকিৎসা চলছিল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি তার দায়িত্ব অতীব নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। প্রায় ৪৫ বছর পর্যন্ত তিনি ফযলে উমর হাসপাতালে সেবা দানের সুযোগ পেয়েছেন। তিনি জামাতের প্রবীণ বুযূর্গদের সেবা করেছেন। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.)-এর সেবা করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন; অত্যন্ত মিশুক ও বিনয়ী ছিলেন। বরং আমি দেখেছি, হাসপাতালের সকল ষ্টাফদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে ভদ্র ছিলেন এবং রোগীরা তাকে বেশ পছন্দ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের মর্যাদা উন্নিত করুন এবং তার স্বজনদের ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন।

তৃতীয় জানাযাটি জনাব মওলানা জাফর মুহাম্মদ জাফর সাহেবের পুত্র নাসের আহমদ জাফর সাহেবের। ইনি একজন সরকারী চাকরিজীবী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন সময় জামাতের সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন। আর অবসর গ্রহণের পর তো পুরোদস্তুর একজন ওয়াকফে যিন্দেগীর মত জামাতের সেবায় নিয়োজিত হন। বিভিন্ন মানুষের সাথে তার অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। আর এই সুসম্পর্কের সুবাদে প্রথমে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.), হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.) এবং পরবর্তীতে আমিও তাকে বিভিন্ন কাজের জন্য পাঠাতাম। তিনি একজন সমাজকর্মীও ছিলেন তাই অন্যেরাও তার সাথে সুসম্পর্ক রাখত। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদাও উন্নিত করুন এবং তার স্বজনদের ধৈর্য ও মনোবল দান করুন। এ সবক'টি গায়েবানা জানাযা এখন নামাযের পর পড়া হবে, ইনশাআল্লাহ্।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

[পুণ:মুদ্রিত]

বাংলাদেশ জামা'তের শতবর্ষ পূর্তি

মাওলানা মাহমুদ আহমদ, আমীর, আহমদীয়া জামা'ত, অস্ট্রেলিয়া

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু লা শারিকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।

বিয়াল্লিশ বছর আগের কথা। সুজলা সুফলা নদীমাতৃক বাংলাদেশের জন্মলগ্নে কে এই রহস্য সম্পর্কে অবহিত ছিল যে, আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর একটি সুন্দর ভবিষ্যদ্বাণী 'পূর্বে বাংলার সম্পর্কে যাহা কিছু আদেশ জারী করা হইয়াছিল, এখন তাহাদের মনোরঞ্জন করা হইবে' পুনরায় ২০১৩ সালেও পূর্ণ হবে? মনে রাখতে হবে, ১৯০৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এবং এটি পরবর্তীকালে বার বার বিভিন্ন রংয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ১৯০৭ সালে "হাকীকাতুল ওহী" পুস্তক রচনা করেন এবং এই বইয়ে ১২৮ নং নিদর্শন হিসেবে এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা লাভের কথা বলেন। ১৯০৫ সালে ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গের আদেশ জারি করে। ফলে বাঙালিরা মনোকষ্টে পতিত হয়। বাংলার জনগণ এই বিভক্তিকরণকে বন্ধ করার জন্য অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালায় এবং ব্যর্থ হয়। বাঙালিদের চোখে তখন লেফটেনান্ট গভর্নর ফুলার ছিল মৃত্যুর ফেরেশতা তুল্য। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি এভাবে পূর্ণ হলো, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যেভাবে হাকীকাতুল ওহী পুস্তকে লিখেছেন, বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর ফুলার সাহেব দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিলেন। তার পদত্যাগের ঘটনায় বাঙালিরা অত্যন্ত খুশি হয়েছিল এবং বাংলা পত্রপত্রিকায় এ-সম্পর্কিত বিভিন্ন আবেগ-উচ্ছ্বাসের প্রকাশও দেখা গিয়েছে। এমনকি তার স্থলাভিষিক্ত-ব্যক্তি নতুন লেফটেনান্ট গভর্নর বাঙালিদের প্রতি মনোরঞ্জনের পলিসি গ্রহণ করবেন বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে এবং যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণীটিতে "মনোরঞ্জন" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল, একইভাবে সংবাদপত্রের রিপোর্টেও সেই একই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

[হাকীকাতুল ওহী, প্রথম বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ২৪৯]।

মনে রাখতে হবে, এই ভবিষ্যদ্বাণীটির এভাবে পরিপূর্ণতা লাভের কথা স্বয়ং মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন এবং এই ঘটনাকে তার সুবিখ্যাত পুস্তক "হাকীকাতুল ওহী'তে নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যাহোক, এটি হলো পরিপূর্ণতার প্রথম ঘটনা।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ১৯০৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর ১৯১১ সালে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি দ্বিতীয় বার পরিপূর্ণতা লাভ করে। বৃটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লীর শাহী-দরবারে ১১ ডিসেম্বর ১৯১১ তারিখে বঙ্গভঙ্গের আদেশ রহিত করেন। বাংলার জনগণ পুনরায় আনন্দিত হয়ে উঠে। এভাবে দ্বিতীয়-দফা বাঙালিদের মনোরঞ্জন করা হয়।

আমি মনে করি ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা তৃতীয়বার বাঙালিদের মনোরঞ্জন করা হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। এভাবেও বাঙালিদের চতুর্থবার মনোরঞ্জন করা হয়।

আর ২০১৩ সালে পঞ্চম বারের মতো হৃদয় জয় করা হচ্ছে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

একশ' বছর আগে বাংলাদেশ জামা'ত গঠিত হয়। তবে এ সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, এর আগেও বাংলাদেশে আহমদী ছিলেন, বলা উচিৎ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দু'জন সাহাবী ছিলেন। এরা হলেন, চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার বটতলী গ্রামের হযরত নুর মোহাম্মদ আনোয়ার কবীর সাহেব (রা.) এবং কিশোরগঞ্জের নাগের গাঁও গ্রামের হযরত রইস উদ্দিন সাহেব (রা.)। এরপর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত মাওলানা সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) ১৯১২ সালে আহমদী হন এবং ১৯১৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে প্রথম বঙ্গীয়-আঞ্জুমান আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিভাষাগতভাবে মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবকে সাহাবী হিসেবে উল্লেখ করা যায় না। কিন্তু, যুগ-ইমাম হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথে তার আন্তরিক পত্র-যোগাযোগ ছিল। বারাহীন-এ-আহমদীয়া পুস্তকের পঞ্চম খন্ডে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের দশটি প্রশ্নের জবাব লিপিবদ্ধ করেছেন। মাওলানা সাহেবের উদ্দেশে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) দু'টি চিঠি লিখেছিলেন। প্রথমটিতে তিনি (আ.) বলেছেন, "আপনার লেখার মধ্যে পুণ্য ও সত্যান্বেষণের আভাস পাওয়া যায়।" আর দ্বিতীয় চিঠিটিতে তিনি (আ.) লিখেছিলেন, "আপনার লেখার মধ্যে 'রুশদ আওর সা'আদাত'-এর সুগন্ধ অনুভব করছি। সুতরাং আপনার ন্যায় একজন রাশেদের (পুণ্যবান ব্যক্তির) জন্য কিছু ব্যয় করা আমার জন্য অত্যন্ত সওয়াবের [কাজ] এবং আখেরাতের জন্য উত্তম-পুরস্কারযোগ্য [কাজ] বলেই মনে করি। আপনি অবশ্যই উত্তর দিয়ে কৃতার্থ করবেন।"

একটি দেশের স্বাধীনতা লাভের বহু গুরুত্ব ও তাৎপর্য আছে। আজ আমরা এখানে যে-দিকটির মুল্যায়ণ করছি, তা এর আধ্যাত্মিক দিক। অর্থাৎ, বাংলাদেশে আহমদীয়া জামা'তের একশ' বছর পূর্তি। আহমদীয়া জামা'তের ইতিহাসে বাংলাদেশ জামা'তের শতবর্ষ পূর্তির বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ,

এর আগে ১৯৮৯ সালে আমরা আহমদীয়া জামা'তের শতবার্ষিকী উদযাপন করেছি এবং ২০০৮ সালে আহমদীয়া খেলাফতের শতবার্ষিকীও উদযাপন করেছি।

আসলে, এ দুটি প্রোগ্রামই ছিল আন্তর্জাতিক, এ দুটি প্রোগ্রামই ছিল কেন্দ্রীয়-জামা'তের প্রোগ্রাম। দেশীয় পর্যায়ে বাংলাদেশই প্রথম দেশ, যারা নিজ দেশে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উদযাপন করছে। সম্প্রতি ফিজি জামা'ত তাদের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান করেছে। এটি বাংলাদেশেরই সৌভাগ্য এবং আমাদের প্রতি মহান আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ রহমত বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ জামা'তের এই শতবর্ষ উদযাপনের বিষয়ে আরো একটি কথা আমার মাথায় এসেছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যুগে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান একই দেশ ছিল। কিন্তু, আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ-ইচ্ছায় প্রথমে পাকিস্তান ও পরবর্তীতে বাংলাদেশ আলাদা দেশ হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করে। পাকিস্তান আলাদা দেশ হলেও তাদের পক্ষে দেশীয়-পর্যায়ে আহমদীয়া জামা'তের শতবর্ষ উদযাপন করা সম্ভব হয় নি। কারণ, সেখানকার বেশ কিছু লোক জামা'ত আহমদীয়াতে শুরু থেকেই ছিল। তাই, ১৯৮৯ সালে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আহমদীয়াতের শতবর্ষ পূর্তির সঙ্গে পাকিস্তানীদেরও শতবর্ষ উদযাপন হয়ে গেছে। কিন্তু বাংলাদেশের কথা আলাদা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যদি স্বাধীন না হতো, তাহলে আজ ২০১৩ সালে আমরা পৃথকভাবে এই অনুষ্ঠান উদযাপন করতে পারতাম না বলাই সঙ্গত। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে স্বাধীন-দেশ প্রদানের পাশাপাশি এই অসাধারণ সুযোগও দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

বাংলাদেশের মানুষ চিরদিনই ধর্মপ্রাণ। কথাটি বলেছেন আমাদের অতিপ্রিয় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)। তার বিখ্যাত পুস্তক 'মাজহাব কি নাম পার খুন' বা 'ধর্মের নামে রক্তপাত' এর ভূমিকায় তিনি এ-কথা উল্লেখ করেছেন।

আহমদীয়া জামা'তের একটি ইংরেজি মাসিক-মুখপত্রের সম্পাদক ছিলেন সাহেবজাদা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব। তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বড় ছেলে মির্যা সুলতান আহমদের পৌত্র। তার বাবার নাম মির্যা আজিজ আহমদ। সাহেবজাদা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব আমার আগে খোদ্দামূল আহমদীয়ার আন্তর্জাতিক সদর ছিলেন। তিনি একদিন আমাকে বলেছেন, তিনি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে এসেছিলেন এবং নারায়ণগঞ্জে তার ভগ্নিপতি সাহেবজাদা মির্যা জাফর আহমদ বার-এট-ল সাহেবের বাসা থেকে সুন্দরবন যাচ্ছিলেন। লঞ্চে তিনি দেখেন যে, একজন যাত্রী বোখারী শরীফ থেকে দরস দিচ্ছেন আর অন্যান্য যাত্রীরা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। তিনি বলেছেন, সফরে সাধারণ মানুষের এই ধর্মানুরাগের পরিচয় পেয়ে তিনি অত্যন্ত অভিভূত হয়েছেন।

অভিভূত হওয়ারই তো কথা। কারণ, সূফী-সাধকদের বিচরণভূমিই তো আমাদের এই দেশ বাংলাদেশ। আল্লাহ্‌র ফজলে আজকে এখানে শুধু ঢাকাবাসীরাই নন, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে লোকজন এসেছেন, এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকেও লোকজন এসেছেন।

বিশ্ব জুড়ে ঢাকা শহরের খ্যাতি আছে মসজিদের শহর হিসেবে। কাজেই, এখানে আগত অতিথিদের হৃদয় জয় করার জন্য সবদিক দিয়েই শান্তিপূর্ণ-পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। যখন তারা নিজ দেশে ফেরত যাবেন, তখন যেন তারা বলতে পারেন, বাংলাদেশ ছোট্ট একটি দেশ এবং এর জনসংখ্যা অনেক বেশি হলেও সেখানকার মানুষ ধর্মপ্রাণ, নানা ধরনের অসুবিধা সত্ত্বেও তারা সেখানে শান্তিপূর্ণ-পরিবেশে সুন্দরভাবে বসবাস করে।

কথায় কথা আসে। তাই প্রসঙ্গক্রমে এসব কথা বলতেই হলো। আমি এখন পুনরায় মূল বক্তব্যে ফিরে আসছি। বাংলাদেশের আহমদীয়াতের একশ' বছরের সফরের বিস্তারিত আলোচনা তো এখানে করতে পারবো না। সময় কম। তাই সংক্ষেপে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ-দিকের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমরা মুসলিম, আমাদের ধর্ম ইসলাম। নবীনেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদের নবী এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ঐশী-গ্রন্থ আল-কুরআনই আমাদের ধর্মগ্রন্থ। তাই, আমাদের অনুষ্ঠানগুলোও ইসলাম এবং কুরআন সম্মত হতে হবে। এর আগে আমরা জামা'তগতভাবে দুটি বড় অনুষ্ঠান পালন করেছি। ১৯৮৯ সালে আহমদীয়া জামা'তের শতবার্ষিকী এবং ২০০৮ সালে আহমদীয়া খেলাফত শতবার্ষিকী। এ ধরনের অনুষ্ঠান কীভাবে উদযাপন করতে হয়, তার যথাযথ-দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টরূপে বলেন:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤٢﴾

অর্থ: এরা (অর্থাৎ মুহাজিররা) সেইসব লোক, যাদেরকে আমরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহ্‌রই হাতে।

(সূরা আল্ হাজ্জ : ৪২)

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

অর্থ: আল্লাহ্‌র সাহায্য ও প্রতিশ্রুত বিজয় যখন আসবে, এবং তুমি দলে দলে আল্লাহ্‌র ধর্মে লোকদেরকে প্রবেশ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার প্রভূ-প্রতিপালকের প্রশংসাসহ (তাঁর) পবিত্রতা (ও) মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি বার বার তওবা গ্রহণকারী।

(সূরা আন্ নাসর: ২-৪)

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾

অর্থ: আর (স্মরণ কর) তোমাদের প্রভূ-প্রতিপালক যখন ঘোষণা করেছিলেন, 'তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের আরো দান করবো। কিন্তু তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে (জেনে রেখো) নিশ্চয় আমার আযাব বড়ই কঠোর।'

(সূরা ইব্‌রাহীম: ৮)

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ
أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ
فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾

অর্থ: এতে সে (অর্থাৎ সোলায়মান) তার (অর্থাৎ মহিলার) কথায় হেসে বললো, 'হে আমার প্রভূ-প্রতিপালক! আমার ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যেসব অনুগ্রহ করেছ, সেগুলোর জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এবং তুমি সন্তুষ্ট হবে এমন সৎ কাজ করার সামর্থ্য আমাকে দাও। আর তুমি নিজ কৃপায় আমাকে তোমার সৎকর্মশীল-বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।'

(সূরা আন্-নাম্‌ল: ২০)

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن
يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ ﴿١٣﴾

অর্থ: আর নিশ্চয় আমরা লুকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছিলাম (এবং তাকে বলেছিলাম,) 'আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। যে-ই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, সে কেবল নিজের কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাকে। আর যে অকৃতজ্ঞ হয় (তার স্মরণ রাখা উচিত) নিশ্চয় আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) প্রশংসার অধিকারী।'

(সূরা লুকমান: ১৩)

মহান আল্লাহ্‌র দানের প্রতিদান অসম্ভব। তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাঁর উপদেশসমূহ পালন করাই একমাত্র সঠিক পথ।

নবীনেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) পবিত্র কুরআনের বাহক ও সাধক। একবার কোনো এক ব্যক্তি তার (সা.) চরিত্র সম্পর্কে বিবি আয়শা (রা.)-এর কাছে জানতে চান। হযরত আয়েশা (রা.) জবাবে বলেছিলেন, 'কানা খুলুকুহুল কুরআন' অর্থাৎ- পবিত্র কুরআনই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

একবার হযরত আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেন এতো ইবাদত-বন্দেগী করেন যে, আপনার পা পর্যন্ত ফুলে যায়? জবাবে হযরত রসূল করীম (সা.) বলেন, হে আয়েশা, আমি কি আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো না?

মহানবী (সা.) যখন মক্কায় ছিলেন তখন কত জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তখন তার পক্ষ থেকে কোনো উগ্রতা ও প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা দেখা যায় নি। তার বিরুদ্ধবাদীরা এবং সমালোচকরা হয়তো বলবে যে, তিনি দুর্বল ছিলেন, তাই কিছু বলেন নি, ইত্যাদি। একসময় আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (সা.)-কে শক্তিশালী করলেন। মক্কা বিজয়ের ঘটনা চিন্তা করুন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করছিলেন, তখন তার অবস্থা কেমন ছিল. তা খোঁজ করুন। তিনি যে উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন তাতে এতটা নীচু হয়ে ঝুকেছিলেন যে, তার চিবুক/থুতনি সেই উটের পিঠে লেগে যাচ্ছিল। বুঝে দেখুন তিনি কতোটা ঝুঁকে গিয়েছিলেন বিনয়বশত: তিনি যেন উটের পিঠেই সেজদাবনত হচ্ছিলেন।

এই সৈন্যবাহিনী যখন আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন আনসারদের কমান্ডার সায়াদ বিন ওবাদা (রা.) আবু সুফিয়ানকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, "আল্লাহ্ আজ তরবারির জোরে মক্কায় প্রবেশ করা আমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন। আজ কোরেশ জাতিকে লাঞ্ছিত করা হবে।" হযরত সায়াদ বিন ওবাদা (রা.) একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। আবু সুফিয়ানের বিভিন্ন দুষ্কর্মের কথা স্মরণ করে হয়তো তিনি একথা বলেছিলেন। যাহোক, আবু সুফিয়ান তখন হযরত রসূল করীম (সা.)-এর কাছে অনুযোগ করে বললো, "আপনি কি আজ আপনার জাতিকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছেন? এই কথা তো বলে গেল একটু আগে আনসার সর্দার সায়াদ ও তার সঙ্গীরা।" সে আরো বললো, "আপনি তো দুনিয়ার বুকে সবার উপরে পুণ্যময়, সব চাইতে বেশি দয়াময়, সর্বাপেক্ষা বড় শান্তিস্থাপনকারী মানুষ। আপনি কি আজ আপনার জাতির অত্যাচার ভুলে যেতে পারেন না?"

তখন মহানবী (সা.) বললেন, "আবু সুফিয়ান, সায়াদ যা বলেছে, তা ঠিক নয়। আজ তো দয়ার দিন। আজ তো আল্লাহ্ তা'আলা কোরেশ এবং খানা-এ কাবাকে সম্মানিত করবেন।"

এরপর মহানবী (সা.) সায়াদকে ডেকে আনালেন এবং তাকে বললেন, "তোমার পতাকা তোমার ছেলে কায়েসের হাতে দাও। এখন তোমার জায়গায় সে-ই হবে আনসারদের কমান্ডার।" কায়েস ছিল একজন কোমল প্রকৃতির নম্র-ভদ্র যুবক; এমন কোমল যে, ইতিহাসে লিখিত আছে, যখন কায়েসের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলো, তখন অনেকে তার সঙ্গে শেষ-সাক্ষাতের জন্য এলেও, বহুলোক এলো না। এতে তিনি তার বন্ধুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কী, অনেকেই তো আমার সঙ্গে শেষ দেখাটাও করতে এলো না! বন্ধুরা বললেন, বহুলোক আপনার কাছে ঋণী। আপনি যদি তাদের কাছে পাওনা টাকা চেয়ে বসেন, সেই ভয়েই তারা আসছে না। তখন কায়েস সারা শহরে ঘোষণা করিয়ে দিলেন যে, তিনি সবার পাওনা টাকা মাফ করে দিয়েছেন। তখন এতো লোক তার কাছে এলো যে, মানুষের ভীরে তার ঘরের সিঁড়ি ভেঙ্গে পড়ল। [নবীনেতা মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম), লেখক: হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ; দ্বিতীয় বাংলা সংস্করণ (২০০৩), পৃষ্ঠা: ১৮৭-১৮৮]।

এই যুগে তাঁরই (সা.) সুযোগ্য গোলাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) আল্লাহ্‌র বিভিন্ন প্রকার ফজলের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন তার রচিত অসংখ্য গদ্যে ও পদ্যে। একটি উর্দু কবিতায় তিনি কত সুন্দরভাবেই না বলেছেন:

হ্যায় শুকরে রব্বে আজওয়াজল

খারেজাজ বায়ান।

(আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমার সাধ্যাতীত।)

এক কাতরা উসকে ফজল নে

দরিয়া বানা দিয়া

(এক বিন্দু জলকে তিনি নহর বানিয়ে দিয়েছেন।

ম্যায় খাঁক থা, উসি নে সুরাইয়া বানা দিয়া।

আমি তো ধূলিকণা ছিলাম, তিনি আমাকে নক্ষত্র বানিয়ে দিয়েছেন।)

[দুররে সামীন (উর্দু)]

বাংলাদেশে আহমদীয়াতের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের কথা বলতে হলে আমাদেরকে জানতে হবে মু'মিনদের জা'মাত কীভাবে বৃদ্ধি লাভ করে। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সূরা ফাত্‌হ এর শেষ আয়াতে

বলেন:

"...এ হলো তাদের দৃষ্টান্ত, যা তওরাতে আছে। আর ইঞ্জিলে এক শস্যক্ষেত্রের সাথে তাদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, যা (প্রথমত) নিজ অঙ্কুর উদগত করে, এরপর একে শক্ত করে, এরপর এটি মোটা হয়ে যায় এবং নিজ কান্ডের উপর দাঁড়িয়ে যায়।..." [সূরা আল্ ফাত্হ, আয়াত: ৩০]

বাংলার মাটিতে দু'জন সাহাবী (রা.) এবং মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। আমি মনে করি, বর্তমানে এটি নিজ কান্ডের উপর দাঁড়িয়ে গেছে। এখন এর আরো পরিবর্ধন ও বিস্তার করা আপনাদের দায়িত্ব। মনে রাখবেন, আহমদীয়াতের উন্নতি হবেই। এটি সুনিশ্চিত। এই গাছের উন্নতিকল্পে বহুলোকের কুরবানি আছে। আল্লাহ্ তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

বাংলাদেশে আহমদীয়াতের প্রাথমিক যুগ থেকেই আহমদীরা মানবসেবায় রত আছে। সংখ্যার বিচারে আমরা কম ছিলাম, এখনো খুব বেশি হয়েছি বলা যায় না। তবে, আন্তরিকতার দিক থেকে আমাদের কমতি নেই। বাংলার আহমদীরা সবসময়ই মানবসেবায় এগিয়ে এসেছে। ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ইত্যাদিতে আহমদীরা সর্বদাই ত্রাণকার্য পরিচালনা করেছে। আপনারা অনেকেই মাওলানা রহমত আলী সাহেবের কথা শুনেছেন। ইন্দোনেশিয়াতে দীর্ঘকাল তিনি ইসলাম প্রচার করেছেন। তৎকালীণ পূর্ব-পাকিস্তানেও তিনি এসেছিলেন। ১৯৫৬ সালে তাকে এবং মোয়াল্লেম আলী আকবর সাহেবকে আমি আমাদের গ্রামে ত্রাণকার্য/রিলিফ পরিচালনা করতে দেখেছি। বাংলাদেশে ভয়ঙ্কর ঘুর্নিঝড় সিডর আঘাত হানার পরও জামা'ত-এ আহমদীয়া সেবা করেছে। আমাদের 'হিউম্যানিটি ফার্স্ট' টিম বাংলাদেশে এসেছিল। এভাবে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের খোদ্দাম, আনসার ও লাজনাগণও মানবসেবা করেছেন।

বাংলাদেশের আহমদীদের নিয়ে আমি গর্ব অনুভব করি এজন্য যে, তারা শুধু নিজ দেশেই নন, বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচারেও অসামান্য ভূমিকা পালন করেছেন। আপনারা খান সাহেব মোবারক আলীর নাম জানেন। তিনি প্রথমে লন্ডনে এবং পরবর্তীতে ১৯২২ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত জার্মেনির বার্লিন-এ মিশনারী হিসেবে কাজ করেন। তিনিই জার্মেনিতে প্রথম আহমদী মিশনারী। এছাড়া, সুফি মুতিউর রহমান বাঙালি ১৯২৮ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এবং আব্দুর রহমান খান বাঙালি ১৯৬৩ থেকে ১৯৭২ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত আমেরিকায় সুদীর্ঘকাল মিশনারী হিসেবে কাজ করেছেন।

আমাদের প্রখ্যাত ইংরেজি ম্যাগাজিন "দি রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স" এর সম্পাদক হিসেবেও বাঙালীরা অবদান রেখেছেন। সুফি মুতিউর রহমান সাহেব ১৯৫১ থেকে ১৯৫৫ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্সের সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। এরপর, মোজাফ্ফর উদ্দিন চৌধুরীও সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়া, আব্দুর রহমান খান বাঙালিও সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। কুরআন করীম ও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তকের ইংরেজি অনুবাদের ক্ষেত্রেও বাঙালিদের অবদান রয়েছে। খান সাহেব মোবারক আলী এবং খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী এক্ষেত্রে কাজ করেছেন।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময়ে কাদিয়ানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বড় নাজুক অবস্থায় ছিল। তখন ৩১৩ জন আহমদী কাদিয়ানের হেফাজতের জন্য সেখানে থেকে যান। এদেরকে দরবেশ বলা হয়। আল্লাহ্‌র ফজলে বাঙালি আহমদীরাও এতে শামেল হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তারা হলেন, দরবেশ মোতালেব সাহেব এবং দরবেশ মৌলভী মোহাম্মদ উমর আলী সাহেব।

বাংলাদেশে আহমদীয়াতের প্রতিষ্ঠা-লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যারা ইসলাম ও আহমদীয়াতের খেদমতে নিরলস কাজ করেছেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ইহকালে এবং পরকালে উত্তম প্রতিদান দান করুন, তাদের বংশধরদেরকেও সৎপথে পরিচালিত করুন, আমীন।

১৯৮৯ সালে জামা'ত-এ আহমদীয়ার একশ' বছরের পূর্তি উপলক্ষে পাকিস্তানের রাবওয়াহতে আলোকসজ্জা ও কিছু মিষ্টি বিতরণের কারণে রাবওয়াহর সমস্ত অধিবাসীর নামে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার মামলা দায়ের করে। আজও এই মামলা ঝুলে রয়েছে। পাকিস্তানে সামরিক কিংবা বেসামরিক যে-সরকারই আসুক না কেন, তাদের কারো পক্ষেই এই কালিমা মোচনের সৌভাগ্য হয় নি। আর হবেই বা কীভাবে! সরকার তো পুলিশ পাঠিয়ে মোল্লার আদেশ পালনের জন্য আহমদীদের মসজিদ, ঘর, বাড়ি, দোকানপাটে লিখিত কলেমা ধুয়ে, মুছে সওয়াব হাসিল করছে এবং ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত থাকার গর্ববোধ করছে।

একজন আহমদী কবি লিখেছেন:

আজান ও নামাজ বন্ধ করবে ঠিক
তবে হৃদয়ের বন্ধন কীভাবে ছিন্ন করবে

জামা'তের শতবার্ষিকী ও খেলাফত শতবার্ষিকী রূহানী প্রোগ্রাম:

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) ১৯৭৩ সালের সালানা জলসায় আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলি প্রোগ্রাম ঘোষণা করেন। আর, হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) ২০০৫ সালে আহমদীয়া খেলাফত শতবার্ষিকী জুবিলির প্রোগ্রাম ঘোষণা করেন। আপনারা জানেন, হযরত সাহেবের এই দো'য়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচিতে কী আছে। হযরত সাহেব বলেছেন, প্রতি মাসে অন্তত একটি নফল রোযা রাখার কথা, প্রতিদিন অন্তত দু' রাকাত নফল নামাজ পড়ার কথা, প্রতিদিন কমপক্ষে সাত বার সূরা ফাতিহা পাঠের কথা। এসব ছাড়াও হুজুর (আই.) বেশ কিছু দো'য়ার তাহরীক করেছিলেন এবং প্রতিদিন কমপক্ষে তেত্রিশবার দরূদ শরীফ পাঠ করতে বলেছিলেন। আর, জামা'তি কর্মকান্ডের দিক থেকে বিভিন্ন টার্গেট তো ছিলই। এ মুহূর্তে শতকরা ৫০% চাঁদা দাতা সদস্যের অসিয়্যতে শামেল হওয়ার কথা মনে পড়ছে।

বাংলাদেশ জামা'তের শতবার্ষিকী জুবিলির প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থেকে এবং সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্নও হয়েছে। আমাদের কাজ দো'য়া ও ধৈর্য দ্বারা আল্লাহর সাহায্য কামনা করা। আর, বাহ্যিক ব্যাপারগুলো অতি সাধারণ। পবিত্র কুরআনের ভাষায়, যদি মাছিও কোনো কিছু নিয়ে যায়, তবে মানুষ সেটাও রক্ষা করতে পারে না। তাই, যা বাস্তব তাই ধরা উচিৎ। আমার মন ও আমার আল্লাহ্‌র মাঝে কে দাঁড়াবে?

বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্য আছে। এখানকার আদালত সুবিচার করে থাকে। অনেক বছর আগে আইনের মাধ্যমে আহমদীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা বিলোপ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। একটি মামলাও করা হয়েছিল, যা সুবিজ্ঞ বিচারক বাতিল করে দেন।

বাংলাদেশের মিডিয়া বা গণমাধ্যম সাধারণত সঠিক বিষয়সমূহ তুলে ধরার ব্যাপারে সোচ্চার। অন্যান্য দেশে এরকমটি তেমন একটা দেখা যায় না। এখানকার সাংবাদিকগণ মনোবল রাখেন। সর্বোপরি, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবি সমাজ এবং সাধারণ মানুষ ধর্মপ্রাণ। এরা সকলেই আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। আমাকে একজন বাঙালি ভদ্রলোক একবার জিজ্ঞাসা করলেন, পাকিস্তানে হিন্দু বেশি নাকি? আমি বললাম, না তো। তিনি বললেন, তবে এতো মোল্লা কেন?

যাহোক, মিডিয়ার প্রসঙ্গ আসায় আরো একটি নেয়ামতের কথা স্বরণ করছি। ১৯৯২ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল বা এমটিএ প্রতিষ্ঠা করেন। শুরু থেকেই বাংলা ভাষায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান এতে দেখানো হচ্ছে। প্রতিদিন এক ঘণ্টা বাংলা অনুষ্ঠান দেখানো হয় এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও বিশেষভাবে হযরত সাহেবের জুম্মার খুৎবার বাংলা অনুবাদ সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। আমাদের এথেকে ফায়দা হাসিল করা উচিত। এমটিএ বাংলাদেশ স্টুডিওস ভাল ভাল অনুষ্ঠান তৈরি করে থাকে। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের পরিচয় তুলে ধরছে। এদের জন্যও দো'য়া করা দরকার। এই শত বছরে বাংলা ভাষায় জামা'তের বহু বইপুস্তক রচিত হয়েছে। বিশেষভাবে অনুবাদের কথা বলতে হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ৯১টি পুস্তকের মধ্য থেকে কম-বেশি ৩০টির বঙ্গানুবাদ হয়ে গেছে। জামা'তের অন্যান্য খলীফা ও আলেমদের বইপুস্তকও অনূদিত হয়েছে।

খলিফার হাতকে শক্তিশালী করা আমাদের দায়িত্ব

আল্লাহ্ আমাদেরকে খেলাফত দিয়েছেন। আমরা সৌভাগ্যবান। কিন্তু, যখনই বড় কোনো নেয়ামত আসে, তখন এর সঙ্গে সঙ্গে জিম্মাদারীও আসে। এখন, খেলাফত বিষয়ক কী কী জিম্মাদারী রয়েছে আমাদের?

আমাদের উচিত আল্লাহ্‌র রশি (হাবলুল্লাহ্) শক্ত করে আঁকড়ে ধরা। এতেই আমাদের নাজাত বা মুক্তি। এতেই আমাদের সাফল্য। এতেই আমাদের উন্নতি এবং নিরাপত্তা। আল্লাহ্‌র রজ্জুকে ঠিক মতো আঁকড়ে ধরলেই আমরা তাঁর কাছ থেকে সমস্ত নেয়ামত লাভ করবো।

হযরত খলিফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) বলেন:

"আমি তোমাদেরকে আরো একটি বিষয়ে বলতে চাই এবং নসিহত করতে চাই। তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। কুরআনকে তোমাদের দিক-নির্দেশক [কোড অভ কন্ডাক্ট] বানাও। মতবিরোধ থেকে বাঁচ। কেননা, মতবিরোধের কারণে মানুষ ঐশী-অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়। মূসার কওম/জাতি এই মতবিরোধের কারণেই বিরান-প্রান্তরে ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু, মহানবী (সা.)-এর উম্মত সতর্ক ছিল, তাই তারা সাফল্য লাভ করেছে। তৃতীয়ত, এখন তোমাদের পালা। ইমামের হাতে তোমাদের অবস্থা তদ্রুপই হওয়া উচিত, যেমন কোনো মৃত-ব্যক্তিকে যখন গোসল করানো হয়, তখন লাশের সঙ্গে সেই গোসল করানো ব্যক্তির হাতের যে-সম্পর্ক হয়। তোমাদের সকল ইচ্ছা ও কামনা ইমামের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত। ইমামকে সেভাবেই অনুসরণ করো, যেভাবে ট্রেনের বগিগুলো ইঞ্জিনকে অনুসরণ করে। তোমরা দেখবে, প্রতিদিনই তোমরা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে অগ্রসর হবে।

সর্বদা ইস্তিগফার করো এবং দো'য়ায় রত থাক। বিশৃঙ্খল হয়ো না এবং অন্যের কল্যাণসাধনে বিরত হয়ো না এবং ন্যায় ব্যবহার প্রদর্শনে বিরত হয়ো না। তের শ' বছর পর এই যুগ এসেছে। দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত এই সময় আর আসবে না। তাই, আল্লাহ্‌র এই অশেষ অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, কারণ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হলে অনুগ্রহ বৃদ্ধি লাভ করে।"

(খুতবাত-এ নুর, পৃষ্ঠা: ১৩১)

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন:

"এ কথা ভালভাবে মনে রাখবে, খেলাফত আল্লাহ্‌র রজ্জু ... এবং এই রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেই কেবল তুমি সাফল্য অর্জন করতে পারবে। যে-ব্যক্তি একে পরিত্যাগ করবে, তার ধ্বংস অনিবার্য।"

(দরসুল কুরআন, পৃষ্ঠা: ৬৭-৮৪, কাদিয়ানে প্রকাশিত)

খেলাফতের একটি মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তার খলিফার দো'য়া বেশি বেশি কবুল করেন। যুগ-খলিফার দোয়ায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য তার পরিপূর্ণ আনুগত্য করা এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা জরুরী। যুগের অবস্থা অনুসারে খলিফা যখনই কোনো হুকুম দেন, দিক-নির্দেশনা দেন, তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। কেননা, তিনিই আমাদের ঐশী উপদেশদাতা। এখানে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ:

১. খলিফার আদেশ শ্রবণ করা: এজন্য তার খুৎবা শুনতে হবে এবং সর্বদা জামা'তের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। যাদের ঘরে এমটিএ কানেক্‌শন নেই, তারা অবশ্যই পাক্ষিকে প্রকাশিত খুৎবার অনুবাদ পড়ে নিবেন। আজকাল তো ইন্টারনেটের জন্য এসবকিছুই অনেক সহজলভ্য হয়ে গেছে।

২. হুকুম আসা মাত্র সেই হুকুম ঠিকমতো পালন করা।

এছাড়া, খলিফার জন্য আমাদের দোয়া করা উচিত। তার জন্য নফল নামাজ পড়ে দোয়া করতে হবে। নিয়মিত চিঠি লিখতে হবে।

যুগ-খলীফার প্রতিনিধি হিসেবে আমি মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান সকলকেই আন্তরিক সালাম জানাই। যে-ব্যক্তি তার নিজ ধর্ম পালন করে, সে-ই ধর্মপ্রাণ।

পরিশেষে, আমি আমার পরিষ্কার মন-মানসিকতা থেকে বলছি, আমার মতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পেছনে এটিও একটি ঐশী রহস্য ছিল যে, ২০১৩ সালে যেন দেশটি দেশীয় পর্যায়ে আহমদীয়াতের শতবর্ষ পালনকারী প্রথম দেশ হতে পারে। সেজন্য আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের কাছেও ঋণী। দো'য়া ও কর্ম-প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই দেশটি গড়ে তোলা আমাদের কর্তব্য।

[২০১৩ সালের আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ৮৯ তম কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় প্রদত্ত বক্তব্য]

খেলাফত : বিশ্ব-মুসলিম ঐক্যের একমাত্র পন্থা

মুহাম্মদ খলীলুর রহমান

১। বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক পরিকল্পনার রূপরেখা ও খেলাফত:

এই মহা বিশ্ব-জগত উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্ট হয়নি। বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি-পরিকল্পনার পশ্চাতে নিহিত রয়েছে বিশ্ব-স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহতালার মহান উদ্দেশ্য। তিনি আকাশ- মন্ডল ও যমীন সব কিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের সেবা ও কল্যাণের জন্য এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছেন উৎকৃষ্টতম উপাদান দিয়ে, শ্রেষ্ঠতম-সৃষ্টি রূপে (সূরা গাসিয়া: ১৪, সূরা আম্বিয়া : ১৭, সূরা ত্বীন: ৫)।

দ্বিতীয়ত : বিশ্ব-সৃষ্টির কেন্দ্র -বিন্দু তথা মানুষকে আল্লাহতালা সৃষ্টি করেছেন তাঁর বিশেষ প্রতিনিধি বা 'খলিফা' হিসেবে (সূরা বাকারা : ৩১)। তিনি সকল ধরনের মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্যে এবং ঐশী গুনাবলীর প্রতিফলনকারী ('আবেদ') হিসেবে ঃ ***"ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়াবুদুন"*** (সুরা জারিয়াত: ৫৭)।

তৃতীয়ত: ঐশী-উদ্দেশ্য পূর্ণ করার লক্ষ্যে যুগে যুগে মানুষের পথ-প্রদর্শনের জন্যে আল্লাহতালা বলেছেন : ***"ওয়ালাকাদ বায়াছনা ফি কুল্লে উম্মাতির রাসূল"***। অর্থ- এবং নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেক (উমমত) জাতির মধ্যে কোন না কোন রসূল পাঠিয়েছিলাম" (সূরা নহল : ৩৭)। অনুরূপ ঘোষনা রয়েছে সূরা ইউনুস : ৪৮ সূরা রাদ : ৮ আয়াতে।

বর্তমান মানব-সভ্যতার আদিলগ্নে প্রেরিত হয়েছেন হযরত আদম (আ.)। সেই সময় থেকে শুরু করে মানুষের সর্বাঙ্গীন তথা দৈহিক , নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের জন্যে নবী- রসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন । কখনও তাঁরা এসেছেন ঐশী বিধানসহ শরীয়ত-বাহক নবী হিসেবে, কখনও কোন নির্দিষ্ট শরীয়তের পূনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে। যেমন- হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দুটি বংশধারার মধ্যে বনী -ইস্রায়েলী ধারায় হযরত মূসা (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন তৌরাতের বিধান সহ এবং পরবর্তীতে সেই বিধানের পূনঃ প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রচারের জন্য অনেক শরীয়ত-বিহীন নবী এসেছেন। হযরত মূসা (আ.) এর আবির্ভাবের তের শত বছর পর-বনী-ইস্রায়েলী নবুওয়তের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে যীশুখৃষ্ট তথা হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের মাধ্যমে।

চতুর্থতঃ ঐশী-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দ্বিতীয় বংশ-ধারা তথা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশে বিশ্ব-নবী খাতামান নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) -কে আল্লাহ্ তাআলা প্রেরন করেছেন ।

আধুনিক বিশ্ব- সভ্যতার উষালগ্নে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে প্রেরণ করেছেন অতীতের সকল নবী-রসূলের বিধি-বিধানের অন্তর্নিহিত শিক্ষার পূর্নতা বিধানের উদ্দেশে। পৃথিবীর সকল জাতির সকল মানুষ এবং ভবিষ্যতের সকল প্রকার প্রয়োজন পূর্ণ করার উপযোগী সর্বশেষ ধর্মীয়-নীতিমালা এবং আইন-কানুন সম্বলিত পবিত্র কুরআন আবির্ভূত হয়েছে মহানবী (সা:)- এর উপর। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তালা এই ঘোষনা দিয়েছেনঃ

"আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নে'মাতী ওয়া রাযীতু লাকুমুল ইসলামা দ্বীনা" অর্থ: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (ধর্ম) কে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত (অনুগ্রহ) কে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্ম-রূপে মনোনীত করলাম" (সূরা মায়েদা: ৪)।

যেহেতু ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) সর্বকালের সকল মানুষের জন্য বিশ্ব-কল্যাণ স্বরূপ (আম্বিয়া: ১০৮) এবং পথ-প্রদর্শক হিসেবে আগমন করেছেন, সেই কারণে তাঁর আবির্ভাব-যুগ থেকে এমন এক বিশ্ব-সভ্যতার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে, যা ইতিপূর্বে কখনো সংঘটিত হয় নাই।

পঞ্চমত: মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর বিশ্ব-নবী হওয়ার এবং পবিত্র কুরআনের পরিপূর্ণ ধর্মীয়-বিধান হওয়ার দুটি মূল দিক রয়েছে। প্রথমটি হলো ইসলামের হেদায়েতের পূর্নতা (তকমীলে হেদায়েতে দ্বীন) এবং দ্বিতীয়টি হলো ইসলামের পূর্ন প্রচার (তকমীলে ইশায়েতে দ্বীন)। এখন পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ জনগণ মুসলমান হিসেবে নিজেদের পরিচয়-দানকারী বলে পরিসংখ্যানে বলা হলেও বর্তমান মুসলমানগন বহু দল ও উপদলে তথা হাদীসের ভবিষ্যৎদ্বানী অনুযায়ী ৭৩দলে (৭২+১) বিভক্ত (তিরমিযি)। এই অবস্থায় অবশিষ্ট লোকজনের জন্য পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার পূর্ণ করা প্রয়োজন। সেই সংগে বর্তমান কালের বহু দলে বিভক্ত মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা পূনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং আদর্শের ভিত্তিতে তাদেরকে একমন্ডলী-ভুক্ত করার লক্ষ্যে ঐশী-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত খেলাফত-ব্যবস্থা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই। বর্তমান বিশ্বের জটিল সমস্যাবলীর প্রেক্ষাপটে আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষনা করতে চাই যে, শুধু মানবীয় চেষ্টা ও বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত কোন সংগঠন, তা কোন ধর্মের নামে তৈরী সংগঠনই হোক অথবা তথাকথিত পার্থিব কল্যান-ভিত্তিক সংগঠনই হোক না কেন, প্রকৃত শান্তি ও কল্যানময় বিশ্ব-সমাজ গঠন করতে পারছে না। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভবিষ্যৎবানীর আলোকে বিষয়টি বিশ্লেষন করা প্রয়োজন।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর তিরোধানের পর ইসলামের প্রচার ও পূন:প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা নূরে ঐশী- প্রতিশ্রুত পথ ও পন্থা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে: ***"ওয়াদাল্লাহুল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়া আমেলুস সালেহাতে লাইয়াছতাখ-লেফান্নাহুম ফিল আরদে কামাস্‌তাখলাফাল্লাযিনা মিন কাবলেহিম, ওয়ালা ইউমাক্কেনান্নালাহুম দীনাহুমুল্লাযিরতাযা লাহুম ওয়ালা ইউবাদ্দেলান্নাহুম মিম বা'দে খাওফেহিম আমনা। ইয়াবুদুনানি লাইঈয়ুশরেকুনা বি শাইয়া, ওয়ামান কাফারা বা'দা যালেকা ফাউলায়েকা হুমুল ফাসেকুন!"*** (সূরা নূর-রুকু:৭)। অর্থ- "আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বাসী এবং সৎকর্মশীল মুসলমানদের সাথে এই ওয়াদা করেছেন, আল্লাহ্‌তা'লা এই উম্মতে সেইভাবে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন, যেভাবে তিনি পূর্বে (মুসা (আ.)-এর পরবর্তীকালে) খেলাফত কায়েম করেছিলেন। এই খেলাফতের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌তা'লা সমগ্র বিশ্বে দীন-ইসলামকে সুদৃঢ় করবেন, মুসলমানদের সর্বপ্রকার ভীতিজনক অবস্থার পরিবর্তে তাদের মধ্যে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। (ঐ খেলাফতের রজ্জুকে যারা আঁকড়ে ধরে থাকবে) তাদের জন্য কোন ভয় বা ভীতির কারণ নেই। আল্লাহ্‌র এরূপ অঙ্গীকার সত্বেও উক্ত খেলাফতকে যারা অমান্য করবে, তারাই পথভ্রষ্ট (ফাসেক) বলে গণ্য হবে।"

উপরোক্ত ***'আয়াতে ইস্তেখলাফ'***- অর্থাৎ খেলাফত সংক্রান্ত আয়াতে কয়েকটি অতীব-গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়গুলো বিশেষভাবে মুসলিম-সমাজ এবং বিশ্ববাসীর জন্য চিরস্থায়ী-কল্যাণ এবং সত্যের চূড়ান্ত-বিজয়ের পথে আশার আলোক-বর্তিকা স্বরূপ।

এই বিষয়গুলোর সার-সংক্ষেপ হলো:

১) আল্লাহ্ তাআলা খেলাফতের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ।

২) ইমানদার এবং সৎকর্ম সম্পাদনকারীদের সঙ্গে উপরোক্ত ঐশী-প্রতিশ্রুতি করা হয়েছে।

৩) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের পূর্বে অর্থাৎ- তৌরাতের শরীয়তবাহী নবী হযরত মুসা (আ.)-এর পর যেভাবে আল্লাহতালা খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এখন মুসলিম উম্মতের মধ্যে সেভাবেই তিনি খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন।

৪) খেলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলাম-ধর্মকে তিনি সুদৃঢ় এবং শক্তিশালী করবেন। অর্থাৎ- এই খেলাফতের মাধ্যমে সত্য-ধর্ম ইসলামের বিজয় হবে- অন্য কোন পদ্ধতিতে নয়।

৫) খেলাফত ব্যবস্থার বিরোধিতা এবং ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হওয়া অবধারিত। কিন্তু খেলাফতের মাধ্যমে আল্লাহতালা এরূপ অবস্থা পরিবর্তন করত: নিরাপত্তা এবং শান্তিপূর্ণ-পরিস্থিতি তৈরি করবেন ।

৬) খেলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তালার ইবাদত তথা তৌহিদের শিক্ষা ও আদর্শ সমুন্নত থাকবে এবং 'শিরক' তথা অংশীবাদীতা দূরীভূত হবে ।

৭) যারা অবিশ্বাস করবে এবং খেলাফতের আনুগত্য করবে না, তারা 'ফাসেকীন' অর্থাৎ দুস্কৃতকারীদের অর্ন্তভূক্ত হবে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, উক্ত ঐশী-ভবিষ্যৎবানীটি সাধারন যুক্তি, জ্ঞান এবং পৃথিবীর যে কোন সংগঠনের ব্যবস্থাপনার মৌলিক নীতিমালা দ্বারাও প্রমানীত। বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা জানি যে, যে-কোন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নেতা এবং 'Chain of command' থাকে। ধর্ম আল্লাহ্ তাআলার তৈরী, মানুষের তৈরী নয়। ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার মৌলিক দায়িত্ব হযরত আদম (আ.) থেকে অদ্যাবধি আল্লাহ্‌তালাই করেছেন এবং করবেন-সেটাই যুক্তি-সংগত। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার অনুমোদিত ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। নেতাহীন সংগঠনে এবং সমাজে বিশৃংখলার ছড়াছড়ি থাকাই স্বাভাবিক। মুসলমানদের মধ্যে বর্তমান যুগে অনৈক্য এবং বিশৃংখলার মূল কারণ এটাই।

এই আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি সাধারণ কোন বিষয় নয়। প্রথমতঃ মূলকথা হলো আল্লাহ্‌তালা স্বয়ং খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে, যারা ঈমানদার এবং সৎকর্ম-সম্পাদনকারী। অন্য কোন ব্যক্তি বা দল আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত ঃ খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য ঈমানদার ও নেক-আমল বিশিষ্ট লোকদের বিদ্যমান থাকা অত্যাবশ্যক। সুতরাং এই আধ্যাত্মিক-নীতির দ্বারা একথা প্রমানিত হয় যে, যেহেতু খেলাফতের প্রসঙ্গ সামনে রেখেই প্রথমে ঈমান ও আমলের কথা বলা হয়েছে, সেই কারণেই খেলাফত না থাকার অর্থ ঈমানদার এবং সৎকর্মশীল লোকজনের অভাব বা অনুপস্থিতি। এই বিষয়টির জন্য অংকশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী যৌক্তিক ফলাফল হলো যেখানে এবং যখন ঈমান+আমল যুগপৎভাবে উপস্থিত নাই, তখন খেলাফতের ঐশী ওয়াদা পূর্ণতা লাভ করবে না। বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য বিশ্ব-সমস্যাবলীর সমাধানের ব্যর্থতা এবং বিশ্ব-মুসলিম ঐক্যের অভাব মূলত: এই কারণেই। খলিফা হওয়ার কোন দাবীকারী আছে কিনা এবং সেই দাবী কতটা ঈমান ও আমলের মাপকাঠি এবং ঐশী অনুমোদন দ্বারা সত্যায়িত, তা নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক।

তৃতীয়ত: ***'আয়াতে ইস্তেখলাফ'*** (সূরা নূর) থেকে আর একটি বিষয় বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী শরীয়ত বা কিতাবধারী নবী হযরত মূসা (আ:)-এর ১৩০০ বছর পর হযরত ঈসা (আ:) এর আগমন হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে,

"ইন্না আরসালনা ইলাইকুম রাসুলান শাহেদান আলাইকুম কামা আরসালনা ইলা ফেরআউনা রাসূলা" (মুযযামেল: ১৬)। অর্থ: "নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট প্রেরন করেছি এক রসুল তোমাদের উপর সাক্ষীস্বরূপ, যেভাবে ফেরাউনের নিকট প্রেরন করেছিলাম একজন রসূল"।

অনুরূপভাবে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর আগমনের তেরশত বছর পর ঈসা-সদৃশ এমন এক মহাপুরুষের আবির্ভাবের ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে, যার মাধ্যমে মুহাম্মদী শরীয়তের প্রচার ও পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি হবেন "খলিফাতুল্লাহ," ইমাম মাহদী এবং মসীহ মাওউদ (আ.)।

চতুর্থতঃ খেলাফতের প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামের সংরক্ষণ ও সুদৃঢ়ভাবে পুনঃস্থাপনের জন্য এই আয়াতে যে ঐশী প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন । প্রসংগতঃ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর একটি হাদীসের ভবিষ্যদ্বানী কিভাবে উক্ত ঐশী প্রতিশ্রুতির সংগে সম্পৃক্ত, তা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় । হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে নবুওয়াত ততক্ষন পর্যন্ত বর্তমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌তালা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্‌তালা উহা উঠিয়ে নিবেন । ইহার পর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং উহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহতালা চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ উহা উঠিয়ে নিবেন। অত:পর উহা অহঙ্কার ও জবরদস্তি-মূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে এবং উহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ চাইবেন। অত:পর আল্লাহ্‌ উহা উঠিয়ে নিবেন। ইহার পর যুলুম ও উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে এবং ইহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্‌ উহা উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে । অতঃপর তিনি চুপ থাকলেন, (ছুম্মা সাকাতা)" (মিশকাত,আহমদ, বায়হাকী)।

মহানবী (সা:)- এর ইন্তেকালের পর ইসলামের সুমহান শিক্ষা এবং সৌন্দর্যকে প্রচার ও প্রসার কল্পে 'খোলাফায়ে রাশেদীন' হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা:) এবং হযরত আলী (রা.) গৌরবোজ্জল ভূমিকা পালন করেছেন। যদিও কালক্রমে ইসলামের সুমহান শিক্ষা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে বিস্তৃতি লাভে করতে থাকে, তবুও পার্থিব স্বার্থ-সিদ্ধির রাজনীতি, প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র, ইত্যাদি কারণে পরবর্তী মুসলিম শাসকগণ নামের আগে খলিফা শব্দটি ব্যবহার করলেও তাঁরা খোলাফায়ে রাশেদীনের মত আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে খলিফা পদবাচ্য ছিলেন না। বরং তাঁরা ছিলেন বংশানুক্রমে রাজা-বাদশাহ, সুলতান অথবা সামরিক-শাসক।

এই ধরনের শাসকদের নামমাত্র খলীফা পদবী গ্রহণের ইতিহাস, উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বানীর সত্যতা দ্বারা প্রমানিত হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে উমাইয়া শাসন (৬৬১-৭৫০ খৃ:), স্পেনে উমাইয়া শাসন (৯১৬-১০৩১ খৃ:), বাগদাদে আব্বাসীয় শাসন (৭৫০-১১৫৮ খৃ:), মিশরে আব্বাসীয় শাসন (১১৭২-১৫১৭ খৃ:) এবং পরিশেষে তুরস্কে উসমানিয়া শাসন (১৫১৭-১৯১৪ খৃ:)।

উল্লেখ্য যে, খেলাফতে রাশেদার পরবর্তী শাসকদের জন্য মহানবী (সা.) উপরোক্ত হাদীসে খলীফা শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তুরস্কের উসমানীয়া শাসক দ্বিতীয় আব্দুল হামীদ ১৯০৮ খৃ: সনে সিংহাসন-চ্যুত হন এবং পরবর্তীতে ১৯২৪ খৃ: সনে তুরস্কের মোস্তফা কামাল পাশার নেতৃত্বে খেলাফত পদ্ধতির অবলুপ্তি ঘোষনা করা হয়।

সেই সময় থেকে অদ্যাবধি ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যতবারই চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে প্রতিবারই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে । দৃষ্টান্তস্বরূপ-ভারতবর্ষে বৃটিশ-শাসনামলে 'খেলাফত আন্দোলন' পরিচালিত হয়েছে এবং সেই আন্দোলনের প্রতি বিধর্মী নেতৃবৃন্দও রাজনৈতিক কারণে সমর্থন দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও নানা প্রকার জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে খেলাফত প্রতিষ্ঠার অনেক আন্দোলন এখনও চলছে। তারা পবিত্র কুরআনের নীতিগত বিষয়টি বুঝতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে নিজেরা খেলাফত ব্যবস্থা তৈরী করতে চেষ্টা করছেন, যা কখনই সম্ভবপর নয়। কারণ ধর্ম কখনই মানুষের-তৈরী বিষয় নয়।

বাস্তবক্ষেত্রে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে ঐশী নির্দেশ মোতাবেক আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের খেলাফতের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভবিষৎদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্যতীত সত্যিকার অর্থে অন্য কোথাও ঐশী-প্রতিশ্রুত খেলাফতের অস্তিত্ব নেই।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অনেকগুলো ভবিষ্যদ্বাণী অনুয়ায়ী হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল মোতাবেক খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ ইসলামের পুনর্জাগরন এবং বিশ্ব-বিজয়ের জন্যে হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের যুগ বলে চিহ্নিত। আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) ঐশী নির্দেশে দাবী করেছেন যে, আকাশ হতে কোন মসীহ্‌ আগমন করবেন না এবং যমীনের কোন গুহা থেকেও কোন লুক্কায়িত মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে না, বরং তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মাহদী ও মসীহ্‌, যাঁকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্বয়ং সালাম পৌঁছিয়েছেন এবং তাঁকে গ্রহণ করার জন্যে বরফের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও বয়আত নেয়ার জন্যে তাগিদ দিয়েছেন। তাঁর দাবীর সত্যতার প্রমাণ-স্বরূপ তিনি ঘোষণা করেছেন যে- (ক) তিনি ইসলামের পবিত্র-শিক্ষাসহ আগমন করেছেন, (খ) তাঁর দাবীর সমর্থনে বড় বড় ঐশী-নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে, (গ) ধর্মীয়-গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ যথার্থভাবে পূর্ণ হয়েছে এবং (ঘ) তাঁর ব্যক্তি- চরিত্রের নিষ্কলুষতার বাস্তব সাক্ষ্য বিদ্যমান। আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁকে জানিয়েছেন যে, ইসলাম সমগ্র-বিশ্বে বিজয় লাভ করবে। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে জানিয়েছেন: "আমি তোমার অনুসারী এই জামা'তাকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যান্যদের উপর বিজয় দান করব" (আল-ওসিয়্যত)। আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁকে জানিয়েছেন: "আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছাবো।"

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বলেছেন:

"খলীফা রসূলের 'যিল্ল' বা প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেন। যেহেতু কোন মানুষ অমর নয়, তাই খোদা তাআলা ইচ্ছা করেছেন যে, সর্বোৎকৃষ্ট মানব রসুল (হযরত মুহাম্মদ সা.)- এর অস্তিত্বকে রূপকভাবে কেয়ামত পর্যন্ত চিরস্থায়ী করে রাখেন-এই কারণে খোদাতা'লা খেলাফতের ব্যবস্থা করেছেন, যাতে মানবজাতি কখনই এবং কোন যুগেই রেসালতের বরকত ও আশীষ হতে বঞ্চিত না হয়"(আল-ওসিয়্যত পুস্তক)।

পবিত্র কুরআনের সূরা নূরের ঐশী-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মুহাম্মদী উম্মতের ***'খাতামুল-খোলাফা'*** হিসেবে ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর আগমন এবং হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীর শেষোক্ত বিষয়টি অর্থাৎ 'সুম্মা সাকাতা' (অত:পর তিনি চুপ করলেন) অর্থাৎ সমাগত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)- এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বর্তমান কালের পুন:প্রতিষ্ঠিত ইসলামী খেলাফত কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। সংক্ষেপে এটাই হলো বিশ্বব্যপী আধ্যাত্মিক-পরিকল্পনার রূপরেখা। এই রূপরেখার বাস্তবায়নের উপরই নির্ভর করছে বিশ্ব-মুসলিম ঐক্য এবং ইসলামের মহাবিজয় ।

[নোট: প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি বিষয় অর্থসহ উল্লেখ করা প্রয়োজন। যেমন- 'ইমাম মাহদী' এর বাংলা অর্থ- 'হেদায়েত প্রাপ্ত ধর্মীয় নেতা'; 'খলিফাতুল্লাহ্‌' এর অর্থ- 'আল্লাহ্‌র খলিফা'; 'মসীহ মাওউদ' এর অর্থ 'প্রতিশ্রুত বা ওয়াদাকৃত মসীহ্‌' বা ঈসা (আ.); 'খলিফাতুল মসীহ্‌' এর অর্থ 'প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ বা ঈসা'-র স্থলাভিষিক্ত খলিফা'।]

(চলবে)

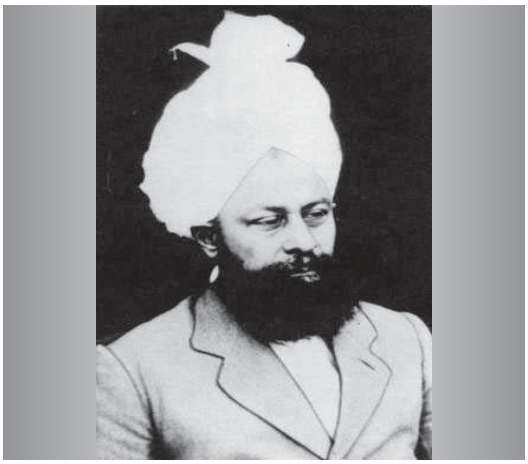

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)

বশীর উদ্দীন আহমদ

২০, ফেব্রুয়ারি আহমদীয়া জামাতের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। শুধু আহমদীয়াতের ইতিহাসে নয়, ইসলামের ইতিহাসেও এই দিনটি একটি স্মরণীয়-দিন। বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামাত এই দিনটি "মুসলেহ্ মাওউদ দিবস" অর্থাৎ "প্রতিশ্রুত সংস্কারক" দিবস হিসাবে পালন করে থাকে। এইদিন হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দোয়া ও প্রার্থনার কবুলিয়তের দিন। ইসলামের পুনর্জাগরণ ও পুন:প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি (আ.) আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য চেয়ে ৪০ দিন চিল্লাকাশী, নিরব দোয়া ও একান্ত এবাদত বন্দেগীর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যে সুসংবাদ প্রাপ্ত হন, তা একটি ঐতিহাসিক ইশতিহারের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। সবুজ কাগজে ইশতেহারটি প্রকাশিত হয়েছিল বলে এটিকে "সবুজ ইশতেহার" বলা হয়। এই ইশতেহারে হুযূর (আ.) ঘোষণা করেন যে, তাঁর সকরুণ দোয়া ও আহাজারী কবুল করে মহান আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এক প্রতিশ্রুত পুত্রের সুসংবাদ দিয়েছেন, যিনি হবেন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন, সুদর্শন, জ্ঞানী, আধ্যাত্মিক সঞ্জীবনী শক্তি সম্পন্ন। পরবর্তীতে হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদের জন্ম, আহমদীয়া জামাতের ২য় খলীফা হিসাবে দীর্ঘ ৫২ বছরের খেলাফত, ইসলামের প্রচার প্রতিষ্ঠা, জামাতকে দৃঢ়-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা, পবিত্র কুরআনের অভূতপূর্ব ও অতুলনীয় সেবা, নতুন নতুন ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ, কুরআনের অতুলনীয় ব্যাখ্যা প্রদান, দেশে দেশে মসজিদসমূহ ও প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, তথা বিশ্বময় কুরআন ও ইসলামের প্রচারে অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে "মুসলেহ্ মাওউদ" সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে।

মুহাম্মদ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী :

উল্লেখ্য যে, হযরত রসূল করীম (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, "শেষ যুগে উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ বিবাহ করবেন ও সন্তান লাভ করবেন।" এই হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র (আ.) বিবাহ ও সন্তান-লাভ উভয়ই নিদর্শন স্বরূপ হবে। হযরত আকদাস (রা.) ১৮৮৬ সনের ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখের ইশতেহারে তাঁর ৪০ দিনের দোয়া কবুলিয়তের এক বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলেন। এই কবুলিয়তে দোয়ার মাধ্যমে তাঁর ঔরশে বিশেষ এক সন্তান লাভ এবং উক্ত সন্তান দ্বারা সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের সূত্রপাত হওয়ারই ইঙ্গিত ছিল। "মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)" সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার দ্বারা একই সঙ্গে হযরত রসূলে করীম (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতাও প্রকাশিত হয়।

২০ ফেব্রুয়ারির প্রেক্ষাপট :

১৯ শতকের ঐ সময় বৃটিশরাজ শাসিত তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের ছত্রছায়ায় খৃষ্টান পাদ্রীরা খৃষ্টধর্ম প্রচারে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। হাটে, বাজারে, শহরে-বন্দরে বক্তৃতা দিয়ে, পত্র-পত্রিকা, বই পুস্তক প্রকাশনার মাধ্যমে খৃষ্টান মিশনারীরা ইসলামের বিরুদ্ধে কার্যত: যুদ্ধ ঘোষণা করে। রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্বহীন ও হীনবল, অর্থনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত, ধর্মীয়ভাবে অধ:পতিত মুসলমানদেরকে তারা বিভ্রান্ত করে। বিপুল সংখ্যক মুসলমান এ সময় ধর্মান্তরিত হয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। সেই সাথে অন্যান্য উপমহাদেশীয় ধর্মের নেতৃবৃন্দ ও দার্শনিকেরা একযোগে ইসলামের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে খৃষ্টান পাদ্রী, হিন্দু, ও আর্যসমাজী পন্ডিতরা ইসলাম ও এর প্রতিষ্ঠাতার (সা.) বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট প্রচারণায় মত্ত হয়ে উঠে।

ইসলামের এই দুরাবস্থা দেখে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর হৃদয় কেঁদে উঠে। তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। ইসলামের এহেন দুর্দশা তিনি সহ্য করতে পারেন নি। কিন্তু মুসলমানদের মধ্য থেকে কেউ ঐ সব আক্রমণের জবাব দিতে এবং ইসলাম রক্ষায় এগিয়ে আসেন নি।

ইসলামের শত্রুদের অযৌক্তিক আপত্তি, ভিত্তিহীন অভিযোগ এবং ইসলাম-বিরোধী প্রচার-প্রচারণার জবাব দিতে গিয়ে হযরত আকদাস (আ.) এর দোয়া কবুলিয়তের অসংখ্য নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলার সাহায্যে ইসলামের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য তিনি এক অসাধারণ পুস্তক "বারাহীনে আহমদীয়া" রচনা করেন। ঐ অসাধারণ পুস্তকে তিনি দোয়া কবুলিয়তের নিদর্শন উপস্থাপন এবং যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, পবিত্র কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মগ্রন্থ এবং মুহাম্মদ (সা.) শেষ শরীয়তবাহী নবী এবং তার শিক্ষা বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন। ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) হিসেবে দাবীর বহু পূর্ব থেকেই হযরত আকদাস (আ.) এর স্বর্গীয়-নিদর্শনাবলী দেখে তদানিন্তন সুধিমহল স্তম্ভিত হয়েছিলেন এবং পত্র-পত্রিকাগুলো ইসলামের সেবায় তাঁর প্রচেষ্টার কারণে প্রশংসামুখর হয়ে উঠে। কিন্তু ইসলামের শত্রুরা আরও উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা.)

এর চরিত্রের উপর আক্রমণ আরও বাড়িয়ে দেয়।

ইসলাম-বিরোধীদের এহেন আক্রমণাত্মক কার্যক্রমের জবাব দিতে গিয়ে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য কামনায় অনেক দিন ধরে হযরত আকদাস (আ.) সংকল্প করেছিলেন যে, কোথাও গিয়ে মূসা (আ.) এর মত টানা ৪০ দিন আল্লাহ্ তাআলার এবাদত ও দোয়ায় রত থাকবেন, যেখানে কেউ তাকে চিনবে না, জানবে না। এ সময় আল্লাহ্ তাআলা তাকে জানান যে, "তোমার সমস্যাবলীর সমাধান হুশিয়ারপুরে হবে।" সে মোতাবেক মসীহ্ মাওউদ (আ.) হুশিয়ারপুরে গিয়ে চিল্লাকাশীর প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। হুশিয়ারপুর উত্তর-পূর্ব পাঞ্জাবের একটি ছোট্ট শহর ছিল। দাবীর বহু পূর্ব থেকেই হুশিয়ারপুরের শেখ মেহের আলী নামক হুযূর আকদাস (আ.) এর ভক্ত ছিলেন। হুযুর আকদাস (আ.) এর নির্দেশনা মোতাবেক তিনি এক নির্জন বাগানবাড়ির দোতলায় চিল্লাকাশীর সময় হুযূরের থাকার ব্যবস্থা করলেন। বস্তুত ১৮৮৬ সালে হুযূর (আ.) হুশিয়ারপুর যাত্রা করেন। এই সফরে হুযূরের সঙ্গী ছিলেন (১) আব্দুল্লাহ্ সানওয়ারী (২) শেখ হামেদ আলী ও (৩) মিয়া ফতেহ আলী খান। বাগান বাড়ীর নীচ তলায় এই তিন জনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। আর হুযূর (আ.) দোতলায় অবস্থান করেন। ১৮৮৬ সালের জানুয়ারী মাসে হুশিয়ারপুর পৌঁছে চিল্লাকাশী আরম্ভ করার পূর্বেই সকলকে জানিয়ে দেন যে, চিল্লাকাশীতে ৪০ দিন পর্যন্ত বিশেষ দোয়াতে নিমগ্ন থাকার সময় কেউ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে না এবং এটাও তিনি সকলকে জানিয়ে দেন যে, ৪০ দিন পর চিল্লাকাশী শেষ হলে আরও ২০ দিন হুশিয়ারপুরে অবস্থান করবেন। ঐ ২০ দিন দেখা সাক্ষাৎ এবং প্রয়োজনবোধে প্রশ্নের জবাব দেওয়া হবে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে দাওয়াতও কবুল করা হবে। তিনজন সফরসঙ্গীর কর্তব্য নির্ধারণ করে দেন। বলে দেন যে, হুযূর (আ.) এর খাবার পরিবেশনের সময়ও যেন নিরবতা অবলম্বন করা হয়। দোতলায় তিনি একা নামায পড়বেন। নীচের তলায় সাথীরা নামায পড়বেন। জুমুয়ার নামাযের জন্য পূর্ব থেকেই একটি পরিত্যক্ত অনাবাদি নির্জন মসজিদ নির্ধারণ করে রাখা হয়েছিল। জুমুয়ার দিন হুযূর নামায পড়াতেন এবং সহচর তিনজন ছাড়া আর কেউ ঐ মসজিদে আসতেন না।

এভাবে ৪০ দিন একান্ত-নীরব দোয়া ও এবাদতের পর ১৮৮৬ সনের ২০ ফেব্রুয়ারি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দোয়া কবুলিয়তের যাবতীয় সুসংবাদসহ একটি ইশতেহার হুযূর (আ.) প্রকাশ করেন। ঐ ইশতেহারে তাঁর "প্রতিশ্রুত পুত্র" সম্বন্ধে, তাঁর সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে, তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের সম্পর্কে এবং স্যার সৈয়দ ও মহারাজ দিলীপ সিং সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সন্নিবিষ্ট করেন।

রহমতের নিদর্শন–
মুসলেহ মাওউদ (রা.) :

১৮৮৬ সনের ২০ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত ইশতেহারে "প্রতিশ্রুত পুত্র" সম্বন্ধে হযরত আকদাস (আ.) বলেন–

"পরম করুণাময়, পরমদাতা, মহামহিমান্বিত খোদা, যিনি সর্বশক্তিমান–যাঁর মর্যাদা মহা গৌরবময় এবং নাম অতীব মহান আপন ইলহাম দ্বারা সম্বোধন পূর্বক বলেন –

"আমি তোমার প্রার্থনা অনুযায়ী– তোমাকে একটি রহমতের নিদর্শন দিচ্ছি। আমি তোমার কান্না শুনেছি। এবং তোমার দোয়াসমূহকে অনুগ্রহ করে কবুল করেছি এবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর এবং লুধিয়ানার) তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি।

"সুতরাং শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বদান্যতা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হচ্ছো। হে বিজয়ী! তোমার প্রতি সালাম। খোদা বলেছেন, যারা জীবন-প্রত্যাশী, তারা যেন মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি লাভ করে এবং যারা কবরের মধ্যে প্রোথিত, তারা বের হয়ে আসে, যাতে ইসলামের মর্যাদা লোকের কাছে প্রকাশিত হয় এবং সত্যতার যাবতীয় আশিসসমূহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা তার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে এবং মানুষ বুঝে যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং যারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম এবং কিতাব এবং তাঁর রসূলে পাক মুহাম্মদ (সা.)কে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করে থাকে, তারা যেন একটি প্রকাশ্য-নিদর্শন পায় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার হয়।

"সুতরাং, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর এক সুদর্শন এবং পবিত্র-পুত্র তুমি লাভ করবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত, তোমারই সন্তান হবে।"

"সুশ্রী, পবিত্র-পুত্র তোমার মেহমান আসছে। তার নাম ইম্মানুয়েল এবং সুসংবাদদাতাও বটে। তাকে পবিত্রাত্মা দেওয়া হয়েছে। সে কলুষ থেকে পবিত্র। সে আল্লাহ্'র নূর। ধন্য, যে আকাশ থেকে আসে।

"তার সঙ্গে ফযল (বিশেষকৃপা) আছে, যা তার আগমনের সাথে উপস্থিত হবে। সে জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হবে এবং তার সঞ্জিবনী-শক্তি ও পবিত্র-আত্মার প্রসাদ বহুজনকে ব্যধিমুক্ত করবে। সে "কালিমাতুল্লাহ্'–আল্লাহ্ তা'লার বাণী।.....সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান' এবং গাম্ভীর্যশীল হবে। জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে। সে তিনকে চার করবে (এর অর্থ বুঝি নি) সোমবার শুভ সোমবার। সম্মানিত মহৎ, প্রিয়-পুত্র।

"মাযহারুল হাক্কে ওয়া আ'লা কানাল্লাহা নাযালা মিনাস্ সামায়ে"

"অর্থাৎ সত্যের বিকাশ স্থল ও সুউচ্চ, যেন আল্লাহ্ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। তার আগমন বিশেষ কল্যাণময় হবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। জ্যোতিঃ আসছে, জ্যোতিঃ। খোদা তাকে তাঁর সন্তুষ্টির সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে নিজ আত্মদান করব এবং খোদার ছায়া তার মাথায় থাকবে। সে শীঘ্রই বর্ধিত হবে। বন্দীদের মুক্তির কারণ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে। জাতিরা তার কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করবে। তখন তার আত্মিক কেন্দ্র আকাশের দিকে উত্তোলিত হবে।

"ওয়া কানা আমরাম্মাকযিয়া" অর্থাৎ এটাই আল্লাহ্‌র অটল মিমাংসা" (ইশতেহার ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬)।

২২ মার্চ ১৮৮৬ তারিখে আরেকটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা মসীহ্ মাওউদ (আ.) ঘোষণা করেন যে, উল্লিখিত ভাবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অসাধারণ গুণ সম্পন্ন মহান পুত্র নয় বছরের মধ্যে জন্মলাভ করবেন।

এরপর এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তৃতীয় বছর অর্থাৎ ১৮৮৯ সনের ১২ই জানুয়ারী, 'শুভ সোমবার' এই প্রতিশ্রুত পুত্র জন্মগ্রহণ

করেন। তাঁর নাম ১৮৮৮ সালে ১ ডিসেম্বরের ইশতেহারে প্রকাশিত ইলহাম অনুযায়ী বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ রাখা হয়।

মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর দাবী :

সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) তাঁর "মুসলেহ্ মাওউদ" হওয়ার দাবী করতে বারবার অস্বীকার করেছেন। যতদিন না আল্লাহ্ তাআলা তাকে নির্দেশ করেন। "মুসলেহ্ মাওউদ" সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর মধ্যে পূর্ণ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টত:ই বুঝা গিয়েছিল। তাই জামাতের সদস্যরা প্রত্যাশা করছিলেন তিনি যেন নিজেকে "মুসলেহ্ মাওউদ" হিসেবে দাবী করেন। তথাপি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নির্দিষ্টভাবে অবহিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি বিরত থাকেন। অত:পর ১৯৪৪ সনের ৪-৫ জানুয়ারী মধ্যবর্তী রাতে লাহোরে মোকাররম শেখ বশীর আহমদ সাহেবের বাসায় রাত্রীযাপন-কালে হযরত বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ এক রুইয়ার মাধ্যমে জানতে পারেন যে, তিনিই প্রতিশ্রুত "মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)"। তিনি তখন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ২য় খলীফা। পরবর্তীতে ২৮ জানুয়ারী ১৯৪৪ কাদিয়ানে জুমুয়ার খোৎবায় তাঁর "মুসলেহ্ মাওউদ" হওয়ার দাবীর ঘোষণা করেন।

উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীতে "মুসলেহ্ মাওউদ" হিসাবে যেসকল গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে, তার সবগুলিই হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর সুদীর্ঘ ৫২ বছরের খেলাফত কাল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত প্রতিটি বৈশিষ্ট তাঁর খেলাফতকালের কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্টভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর জীবনের কয়েকটি দিক নিচে আলোচিত হলো।

শৈশব কালের এবাদত

শৈশবকালে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) অন্য সব শিশুদের মত ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত এবাদতগুজার ছিলেন। তাঁর পিতার উপর যে ঐশী-দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল, এ বিষয়ে অল্প বয়স থেকেই অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। শৈশব কাল থেকেই এবাদত এবং ধর্মীয় জ্ঞান আহরণের প্রতি তাঁর তীব্র আকাঙ্খা ছিল। মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর এক সাহাবী হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) শৈশবে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)কে দেখেছিলেন। তিনি (রা.) বলেন : মাহমুদের (রা.) চরিত্রে তিনটি বিষয় ছোটকাল থেকেই লক্ষণীয় ছিল। প্রথমত: তার সততা। দ্বিতীয়ত: প্রত্যেকটি বিষয়ে তাঁর নিষ্ঠা, তৃতীয়ত: ধর্মীয় বিষয়ে তাঁর প্রবল আগ্রহ। তিনি (রা.) আরও বলেন যে, তিনি মাহমুদ সাহেবকে নিয়মিতভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখেছেন। তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর বয়স যখন ১০ বছর, তিনি তাঁকে মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পাশে দাঁড়িয়ে মসজিদ আকসায় নামায পড়তে দেখেছেন। যদিও তখনও তিনি বালক ছিলেন। তিনি তাকে সিজদায় আল্লাহ্ তাআলার নিকট বিনত হয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখেছেন।

মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আরও একজন সাহাবী হযরত শেখ গোলাম আহমদ (রা.) বলেন যে, একরাতে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, সারারাত কাদিয়ানে মোবারক মসজিদে আল্লাহ্'র এবাদত করে কাটাবেন। তিনি মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পান যে এক যুবক সিজদায় পড়ে রয়েছেন। এই দৃশ্য দেখে তিনি এতটা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন যে, তিনি নিজে আল্লাহ্ তাআলার নিকট দোয়া করতে থাকেন যে, এই ব্যক্তির মনোবাঞ্ছা যেন কবুল করা হয়। তিনি (রা.) বলেন যে, তিনি জানতেন না যে, তার আসার কত পূর্ব থেকে ঐ ব্যক্তি সিজদায় পড়েছিলেন। তিনি আসার পর দীর্ঘক্ষণ তিনি (রা.) সজদায় ছিলেন। শেষ পর্যন্ত যখন ঐ ব্যক্তি উঠলেন তিনি বুঝতে পারলেন যে, সে ব্যক্তিটি হযরত বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ। তিনি (রা.) তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে গেলেন এবং জানতে চাইলেন আজ রাতে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে কি চেয়ে নিয়েছেন, উত্তরে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, "আমি শুধু চেয়েছি যে, আল্লাহ্ যেন আমাকে ইসলামের পুনর্জাগরণ দেখার সৌভাগ্য দান করেন।" তাঁর এই উত্তর থেকে বুঝা যায় যে, শৈশব কাল থেকেই মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ইসলামের বর্তমান দুরবস্থা, মুসলমানদের ধর্মের সংস্কার এবং ইসলামের শিক্ষার পুণ:প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর অন্তরবেদনাকে কতটা গভীরভাবে ধারণ করেছিলেন। আল্লাহ্ তাআলার নিকট সিজদারত হয়ে তিনি কোন ব্যক্তিগত বিষয় যাচ্না করেননি। বরং প্রকৃত ইসলামের পুনরুত্থানের দৃশ্য স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য কামনা করেছেন।

মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মিশন সফল করার প্রতিজ্ঞা :

২৬ মে ১৯০৮ সনে জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এর ইন্তেকালের পর অত্যন্ত দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। তিনি তাঁর পিতার মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি সমগ্র জগৎ তোমাকে পরিত্যাগ করে, তবুও আমি একা তোমার পাশে থাকবো এবং সকল বিরোধিতা ও অত্যাচারের মুখে মসীহ্ মাওউদের মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাব। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সারা জীবন তাঁর খেলাফতকালে এই প্রতিজ্ঞা সফলভাবে পূরণ করে গিয়েছেন।

খিলাফতের প্রতি সম্মান ও আনুগত্য:

২৭ মে ১৯০৮ সালে হযরত হেকীম মাওলানা নূরুদ্দীন (রা.) প্রথম খলীফা নির্বাচিত হলে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সর্বপ্রথম প্রথম-খলীফার হাতে বয়াত করেন। প্রথম খলীফার ৬ বৎসরের খিলাফতকালে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) খলীফা ও জামাতের প্রতি পূর্ণ-সম্মান ও আনুগত্য প্রদর্শন করেন। প্রথম খিলাফতের সময় জামাতের মধ্যে খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। ঐ সময় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পরিবারের সদস্যরা খলীফার পাশে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন এবং খিলাফতের বিপক্ষে কোন রকম সমালোচনাকে প্রশ্রয় দেন নি।

খিলাফতকাল (১৯১৪-১৯৬৫):

ইসলাম এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পয়গাম বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যই ছিল মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর সকল কাজ ও সিদ্ধান্তের লক্ষ্যবস্তু। ১৪ মার্চ ১৯১৪ সালে ২য় খলীফা হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি মজলিসে শূরার সভা ডাকেন। সেখানে তিনি তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে

গিয়ে বলেন :

'পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে আমি আহমদীয়াতের পয়গাম পৌঁছে দিতে চাই।"

তাঁর লক্ষ্য ছিল স্থির। তিনি পৃথিবীর দেশে দেশে জামাত প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করেন। তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা দুইটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সর্বপ্রথম নীতি ছিল যে-ইসলাম সার্বজনীন ও বৈশ্বিক-ধর্ম। সমগ্র পৃথিবীর প্রতিটি দেশ, শহর, গ্রামে ইসলামকে পৌঁছাতে হবে। দ্বিতীয়তঃ তাঁর দূর-দৃষ্টি দিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এক সময় জামাতকে প্রবল বিরোধিতা এবং কঠিন সময়ের সম্মুখীন হতে হবে। তাই তিনি উপমহাদেশের বাইরের দেশে জামাত প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হাতে নেন। যদি কখনও বিরোধিতা ও অত্যাচার নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন অন্য দেশের আহমদীরা যাতে সমর্থন ও প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারে। সারা পৃথিবীতে জামাত প্রতিষ্ঠা হলে কোন একক সরকারের পক্ষে জামাতকে ধ্বংস করা সম্ভব হবে না। তিনি আহমদীদের বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার জন্য উৎসাহিত করেন। শুধুমাত্র তবলীগের উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সনে "নাজারাত দাওয়াত-ও-তবলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দিকে জামাতের আর্থিক সামর্থ কম থাকা সত্বেও তিনি উপমহাদেশের বাইরেও বিভিন্ন দেশে মিশনারীদের প্রেরণ করেন। মসজিদ ও মিশন হাউজ প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর খেলাফত কালেই পৃথিবীর পঞ্চাশটি নতুন দেশে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এভাবে "মুসলেহ্ মাওউদ" সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর যে অংশে বলা হয়েছিল–"পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে।"–তা পূর্ণতা লাভ করে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর খিলাফত কালে তাঁর নির্দেশনায় জামাত উত্তরোত্তর উন্নতি করতে থাকে, অবকাঠামো তৈরী হতে থাকে। প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত করা হয়। বয়স ও লিঙ্গের ভিত্তিতে জামাতকে ভিন্ন ভিন্ন সহায়ক অঙ্গ-সংগঠনে বিভক্ত করা হয়।

১৯৩৪ সনে "তাহরীকে-জাদীদ" প্রতিষ্ঠা তাঁর মহান কার্যক্রমসমূহের অন্যতম। এর মাধ্যমে জামাত দূর দূরান্তের দেশে দেশে বিস্তৃত হয়। এই স্কীম তিন বৎসরের জন্য হাতে নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৫৩ সনে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) "তাহরীক জাদীদ"-কে স্থায়ী কার্যক্রম হিসাবে ঘোষণা করেন। একই ভাবে ১৯৫৭ সনে মুসলেহ মাওউদ (রা.) 'ওয়াকফে-জাদীদ' প্রতিষ্ঠা করেন তৎকালীন ভারত পাকিস্তানের শহরে, গ্রামে, গঞ্জে, তবলীগ ও তরবিয়তী কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে। এই কার্যক্রমও বর্তমানে জামাতে স্থায়ী রূপ লাভ করেছে।

বিদেশে জামাত প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর মৃত্যুর পর জামাতের নিকট স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। ১৯৮৪ সনে পাকিস্তানে জেনারেল জিয়াউল হকের দুঃশাসনের সময় চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) পাকিস্তান থেকে ইংলন্ডে হিজরত করতে বাধ্য হন। আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফযল যে, যুক্তরাজ্য জামাত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর হাতে বহু পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যুক্তরাজ্য জামাত চতুর্থ খলীফাকে গ্রহণ করতে পেরেছিল। লন্ডনে খিলাফতের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয় এবং আহমদীয়াতের প্রচার বাধাগ্রস্ত হওয়ার পরিবর্তে নতুন রূপ ও ব্যাপকভাবে বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হয়।

১৯২৪ সনে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাঁর ইংল্যান্ড সফরকালে যুক্তরাজ্যে প্রথম মসজিদ "মসজিদে ফজল" এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এই মসজিদ পরবর্তীকালে জামাতের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৮৪ সনে চতুর্থ খলীফার হিজরতের পর এই মসজিদ জামাতের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।

পবিত্র কুরআনের জ্ঞান ও ভালবাসা:

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর কমই ছিল। কিন্তু পার্থিব ও আধ্যাত্মিক প্রতিটি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অত্যন্ত গভীর। তাঁর সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তিমূলে ছিল পবিত্র কুরআন। বস্তুতঃ তিনি আল্লাহ্ তাআলার নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। কুরআনের এই জ্ঞান তিনি নিজের মধ্যে ধরে রাখেন নি। বরং অবিরত ভাবে এই জ্ঞান বিতরণ করে গিয়েছেন। সারা জীবন তিনি ধারাবাহিকভাবে তাঁর খুতবা ও বক্তৃতায় পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর রচিত "তফসীরে-সগীর" ও "তফসীরে কবীর" শুধু জামাতের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য এক বিশেষ খেদমত। এর মাধ্যমে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুত-পুত্রের আগমনে কুরআনের মর্যাদা লোকের কাছে প্রকাশিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। একটি বাক্যে কুরআনের প্রতি তাঁর ভালবাসা ফুটে উঠে। তিনি বলেন :

"কুরআন হলো জ্ঞানের এক মহাসমুদ্র। কুরআন পাঠের অভ্যাস করা উচিত, এর অর্থ নিয়ে চিন্তা করা উচিত। এবং কুরআনের জ্ঞান আহরণ করা উচিত।"

মুহাম্মদ (সা.) এর প্রেম :

মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর গভীর ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। মুহাম্মদ (সা.) এর বিষয়ে কোন খারাপ উক্তি বা হাসি ঠাট্টা শুনলে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হতেন। তাঁর রচিত "হাকিকাতুন নবুওয়াত" পুস্তকে তিনি বলেন: "লোকেরা আমাদের অভিযুক্ত করে যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে নবী হিসেবে বিশ্বাস করে আমরা ইসলামের পবিত্র নবী (সা.) এর অসম্মান করেছি। আমাদের অন্তরের অবস্থা সম্বন্ধে তারা কি জানে? মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি যে গভীর ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি আমরা আমাদের হৃদয়ে পোষণ করি, কিভাবে তারা তা পরিমাপ করতে পারে?"

"মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি যে ভালবাসা আমার হৃদয়ে প্রোথিত আছে, তারা কিভাবে তা বুঝবে? তিনি আমার জীবন, আমার আত্মা, আমার অভিষ্ট লক্ষ্য। তাঁর দাসত্বেই আমার সম্মান। তার পাদুকা-বহন আমার নিকট রাজ সিংহাসনের চেয়েও মর্যাদার বিষয়। সাতটি মহাদেশের রাজত্বও তাঁর গৃহের ঝাড়ুদারের চেয়ে মূল্যহীন। তিনি আল্লাহ্‌র প্রিয় অস্তিত্ব।"

মোটকথা, একজন প্রতিশ্রুত-পুত্রসন্তান লাভ সংক্রান্ত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মহান ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিটি অংশ হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আস্ সানী, আল মুসলেহুল মাওউদ (রা.) এর মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে। তার জীবনের সকল দিক একটি লেখায় শেষ করা সম্ভব নয়। কয়েকটি দিকমাত্র অতি সংক্ষেপে এই লেখায় তুলে ধরা হলো। আমাদের উচিত, এই মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করা। তাঁর শিক্ষায় আলোকিত হয়ে নিজেদের চলার পথ রচনা করা।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) একটি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ

স্যার মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান (রা:)
অনুবাদক: মহিউদ্দিন আহমদ

প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৪ইং মাসে শিয়ালকোট ভ্রমণে আসেন। অন্যান্যরা সহ তাঁর পরিবারের সদস্যরাও তার সাথে ছিলেন। সেই উপলক্ষে আমি হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবকে, যা তিনি সেই সময় ছিলেন, প্রথম দেখি। তাঁর অবস্থানের নির্দ্দিষ্ট স্থান এবং ১৫-১৬ বছর বয়সে তিনি দেখতে কেমন ছিলেন তা আমি এখনও পরিষ্কার স্মরণ করতে পারি। আমি তখন ছিলাম মাত্র ১১ বৎসর বয়সী এবং এতবড় মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের দেখা পেয়ে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হই। তার কাছে যাওয়া বা তাকে সম্ভাষণ করার কথা আমি চিন্তা করারও সাহস পাইনি, যেমন কিনা আমি চাঁদের কাছে যাওয়া বা সম্ভাষণ করার কথা চিন্তা করতে পারতাম।

পরবর্তীতে আমি পিতার সাথে প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে এবং বাৎসরিক জলসার সময় কাদিয়ান যেতাম এবং মাঝে মধ্যে সাহেবজাদা সাহবকে দেখার সুযোগ হতো, কিন্তু তার সাথে নিজ থেকে আলাপ করার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি। ১৯০৭ইং সনে আমি মেট্রিকুলেশন পাশ করি এবং লাহোর চলে যাই। তখন মাঝে মাঝে নিজেই কাদিয়ান আসা যাওয়া করতাম, কিন্তু এটাও আমাদের দু'জনের ভিতরের দুরত্ব সেতুবন্ধনে কোন সহায়ক হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ:) এর পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি, তাঁর সাথে কাছাকাছি আত্মীয়তা বা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত বা জড়িত এমন সবার প্রতি আমার ভিতর ভয় মিশ্রিত সম্মানবোধ ও গভীর শ্রদ্ধার অনুভূতি বিস্তৃত ছিল। ১৯১০ইং সনে (মরহুম) সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) একই কলেজে যোগদান করার আগ পর্যন্ত আমি তাদের কাউকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারিনি।

আইন বিষয়ে পড়ার জন্য ইংল্যান্ড রওয়ানা হওয়ার সময় বিদায় নেয়ার জন্য আগষ্ট ১৯১১ইং মাসে পিতামাতার সঙ্গে (আমার জানামতে সেটা ছিল আমার মায়ের সেখানে প্রথম ভ্রমণ) কাদিয়ান যাই। এ উপলক্ষে সহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ (রা.) এর পরামর্শক্রমে আমি বড় সাহেবজাদা সাহেব এর সাথে সাক্ষাৎ করি, তাকে আমার প্রস্তাবিত ইংল্যান্ড যাত্রার উদ্দেশ্য জানাই এবং আমার জন্য দোয়া করার অনুরোধ করি। আমাকে সহৃদয় অভ্যর্থনা করা হয় এবং যথাযথ প্রজ্ঞা ও পথ-নির্দেশনাপূর্ণ বাক্যদ্বারা পুরষ্কৃত করা হয়। সাক্ষৎকারটি মাত্র কয়েক মিনিটের ছিল। আমি ইংল্যান্ড থেকে সাহস করে দু-একবার তাকে পত্র পাঠাই এবং যথোপযুক্ত উত্তর দ্বারা সম্মানিত হই।

মার্চ ১৯১৪ইং সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ প্রথম (রা.) ইন্তেকাল করেন। এবং সাহেবজাদা মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ দ্বিতীয় হিসেবে তার উত্তরসূরী নির্বাচিত হন। তিনি তৎকালীন আহমদীয়া আন্দোলনের শতকরা ৯৫ ভাগ সদস্যের শ্রদ্ধার্ঘ্য ও আনুগত্য লাভ করেন। আমি তখনও ইংল্যান্ডে ছিলাম। তাঁর নির্বাচিত হওয়ার সংবাদ পাওয়ার দিনই আমি আনুগত্য (বয়াত) এর চিঠি ডাকযোগে প্রেরণ করি। তৎকালীন সময়ে কাদিয়ান ও ইংল্যান্ড এর ভিতর চিঠি উভয়মুখী আদান প্রদানে সতের দিন সময় লাগতো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ২রা আগষ্ট, ১৯১৪ইং তারিখে শুর হয়। আমি ৮ই অক্টোবর লন্ডন ত্যাগ করে নভেম্বরের শুরুতে বাড়িতে এসে পৌছি। সমুদ্রযাত্রা ছিল ঝুকিপূর্ণ। বিশেষত জার্মান ড্রেষ্ট্রয়ার "এমডেন" ভারত মহাসাগর এলাকায় ক্রিয়াশীল ছিল, এবং ইতিমধ্যেই কয়েকটি বৃটিশ জাহাজকে ধ্বংস করেছিল। আমি যে জাহাজে করে ভ্রমণ করছিলাম "এস.এস.এরাবিয়া" সেবার নিরাপদে বোম্বে পৌছে, কিন্তু পরবর্তী এক সমুদ্রযাত্রায় "এমডেন" কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে ডুবে যায়।

বোম্বে থেকে যাত্রা পথে আমি প্রথমে কাদিয়ান যাই এবং মৌখিক সত্যায়নের মাধ্যমে খলীফাতুল মসীহ দ্বিতীয় (রা.) এর প্রতি আমার লিখিত (ইতিপূর্বে প্রেরিত) আনুগত্যের নবায়ন করি। এটাই ছিল তাঁর সাথে আমার প্রথম প্রকৃত সাক্ষাৎকার। যদিও ইতিমধ্যে তিনি মর্যাদায় অত্যুচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন এবং বর্তমানে তিনি আমার আধ্যাত্মিক গুরু এবং প্রভু, যার প্রতি আমি আমার হৃদয়ের গভীরতম ও অকৃত্রিম-আনুগত্য পোষণ করি, যার প্রতি আমি সম্পূর্ণরূপে অনুরক্ত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তার উপস্থিতিতে আমি যতটা ধারণা করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক কম লাজুকতা অনুভব করি, এবং যে কথাবার্তা হয়, তাতে বিনীত ও সম্মানজনক ভাবে বুদ্ধিমত্তার সাথে আচরণ করতে সক্ষম হই। আমি তাঁর সম্ভ্রম উদ্রেগকারী ও সদয় উপস্থিতি থেকে আধ্যাত্মিক পরিতুষ্টিজনক মানসিক অবস্থা ও পূর্ণ নিরাপত্তার অনুভূতি ও নিশ্চয়তাসহ বের হয়ে আসি।

ইতিমধ্যে অর্ধশতাব্দি পার হয়েছে। এটা সংক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা লেখার একটা প্রচেষ্টা মাত্র। সেটাও একটি প্রবন্ধের স্বীকৃত দৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক বড় হয়ে যেতে পারতো, সুতরাং সীমার ভিতর রাখার জন্য অবশ্যই কাটছাঁট করতে হবে এবং সংক্ষিপ্ত করতে হবে। সেই সুউচ্চ কর্মশক্তিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব-এর নির্দেশ ও পরিচালনায় ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে পৃথিবীর নিকট ও দূরবর্তী কোণ সমূহে যে নৈতিক ও আধ্যাতিক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সেই অর্ধ শতাব্দিতে সাধিত হয়, আমি তার একটি সাধারণ রেখাচিত্র অঙ্কন করার চেষ্টা করবো না। কাজটি অবশ্যই তাদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে, যারা তথ্যাবলীর সাথে অধিকতর অবহিত এবং প্রয়োজনীয় ও যথাযোগ্য মূল্যায়ন এবং মূল্য নির্ধারণে অনেক বেশী যোগ্য, আমি যেমন দাবী করতে পারি তার চেয়ে .....

এটা উপলব্ধির বিষয় যে, যেমন পবিত্র কুরআন এর আয়াত নং ৪, সূরা জুমুআতে বর্ণিত ভবিষ্যৎবাণী মোতাবেক মসীহ মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে মহানবী (সা.) এর দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হয় এবং আমরা

প্রথমজনের ভিতর দ্বিতীয়জনের আধ্যাত্মিক প্রতিচ্ছবি দেখতে অভ্যস্ত, তেমনিভাবে আমরা তার দ্বিতীয় উত্তরসূরী, যে কিনা তার প্রতিশ্রুত পুত্র এবং ভবিষ্যৎবাণীর কথা অনুযায়ী "সৌন্দর্য্য ও মহানুভবতায়" তাঁর মতো, তার প্রতিফলন আশা করতাম। এই আকাঙ্ক্ষায় আমরা কোনক্রমেই হতাশ হইনি, এবং আমরা এর উত্তরোত্তর বর্ধনশীল পূর্ণতা প্রত্যক্ষ করেছি, যার অনেক দিক আছে। আমি এখানে এক বা দু'টি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবো।

মহানবী (সা.) এর অত্যুচ্চ গুণাবলী সম্বন্ধে মহান আল্লাহ্ তাআলা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, "..... তোমাদের কষ্ট ভোগ করা তার কাছে অসহনীয়, এবং সে তোমাদের (কল্যানের) পরম আকাঙ্ক্ষী। সে মুমিনদের প্রতি অতি মমতাশীল ও বার বার কৃপাকারী।" (সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১২৮)

খলীফাতুল মসীহ দ্বিতীয় (রা.)-এর পক্ষে এই আয়াতে উল্লিখিত গুণাবলীর প্রকাশ এই অধম-বান্দা নিজে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে সাক্ষী হয়েছি, যা এত বেশী সংখ্যক যে, এখানে তার বিস্তৃত বর্ণনা করা সম্ভব না। আমি মাত্র অল্প কয়েকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

অনেক বছর আগে এক শীতের দিনে, বাটালা হতে কাদিয়ান পর্যন্ত রেল সংযোগের অনেক পূর্বে, আমি লাহোর থেকে কাদিয়ানে আসি। তখন ছিল রমজান মাস। রোযা সমাপ্তির সোয়া ঘন্টা আগে প্রায় বিকাল ৪ টায় আমি পৌঁছি। হযরত সাহেব (রা.) তাঁর তখনকার অভ্যাস মোতাবেক আসর নামাযের পর কিছুক্ষণ মসজিদ মোবারকে অবস্থান করতেন, আমি সেই সময় শ্রদ্ধা জানানোর জন্য নিজেকে উপস্থাপন করি। আমার সম্ভাষণ সহৃদয়ভাবে গ্রহণ করে মৃদু হেসে তিনি নির্দেশ দিলেন যেন আমাকে চা পরিবেশন করা হয়। এটা ছিল অত্যন্ত অস্বাভাবিক, অধিকন্তু আমি রোযাদার ছিলাম। আমার এই কথা বলায় তিনি চোখে অবিশ্বাসের ঝলক এনে ও কণ্ঠস্বরে কোমল ভর্ৎসনার আমেজ এনে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন,"ভ্রমণরত অবস্থায় রোযা রেখেছ? এটি কেমন প্রকারের রোযা হবে? "সুতরাং চা আনা হলো, এবং মসজিদের সকল মুসল্লির মাঝে, যারা সবাই রোযাদার ছিলেন, তিনি এটা নিশ্চিত করলেন যে, আমি আমার ক্লান্তি দূর করি, এবং একই সাথে ভ্রমণ অবস্থায় রোযা মুলতবি রাখার পবিত্র কুরআন এর অনুশাসন অনুসরণ করি।

এইভাবে আমাকে যথাযথ শিক্ষা দেয়া হয় ও সতর্ক করে দেয়া হয়। কিন্তু কেমন কোমল ও ফলপ্রদ ছিল সতর্ক করে দেয়ার পন্থা।

হাইকোর্টের এক আপীল মামলায় কাদিয়ানের একটি অংশের পঞ্চাশ একর অতি মূল্যবান জমি, যা কিনা দ্রুত আবাসিক এলাকা রূপে গড়ে উঠছিল, এর মালিকানা-সত্ত্ব বিচারাধীন ছিল। জেলাকোর্টে প্রথম আপীলে রায় হযরত সাহেব (রা.) ও তাঁর ভাইদের বিপক্ষে ছিল। মামলায় উত্থিত দু'টি বিচার্য্য বিষয় ছিল বাস্তব, এবং একটি দ্বিতীয় আপীলে সফলতার অতি সামান্যই সম্ভাবনা ছিল। হযরত সাহেবকেও অনুরূপ পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু তিনি আপীলের জন্য আবেদন করতে বলেন, যেহেতু (মরহুম) সাহেবজাদা মির্যা শরীফ আহমদ (রা.) [খলীফাতুল মসীহ আল খামেসের দাদা] স্বপ্নে দেখেন যে, আপীল সফল হয়েছে। আপীলটি শুনানীর জন্য গৃহীত হয়।

হযরত সাহেব আমাকে ডেকে পাঠান, এবং বলেন, জড়িত বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে স্যার মুহাম্মদ শফী বা মিঃ পিটম্যান (উভয়ই ছিলেন তৎকালীন লাহোর বার এর শীর্ষ স্থানীয় আইনজীবী) কে আপীলে যুক্তি প্রদর্শন করার জন্য নিয়োজিত করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি মনে করেন আন্তরিকতা ও ধার্মিকতাকে অভিজ্ঞতার উপর মূল্যায়ন করা উচিৎ। তিনি মিঞা মুহাম্মদ শরীফ সাহেবকে সাহায্যকারী রেখে আমাকে আপীলটি পরিচালনার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমি অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়লাম। তখন আমার ওকালতীতে প্রথম দিকের সময়, এবং আমার হাইকোর্টে কাজ করার অতি সামান্যই অভিজ্ঞতা ছিল। আইনজীবী-পেশায় স্বীকৃত এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নেতৃস্থানীয়দের পরিবর্তে আমাকে নির্বাচন করা আমার কথিত কোন উৎকর্ষতার জন্য প্রশংসাসূচক উপহার ছিল না, বরং তা ছিল নিছক আমার সম্মানিত ও অতুলনীয় প্রভুর মহানুভবতা ও স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ।

আমি বিচলিত হয়ে পড়ি, কিন্তু হযরত সাহেব (রা.) আমার উপর যে আস্থা স্থাপন করেন, তা দ্বারা সহায়তা ও উদ্দীপ্ত হই। আপীল এর সাফল্যজনক ফলাফলের জন্য তিনি দোয়া করবেন জেনে তা আরও শক্তিশালী হয়। আমার সম্মানিত সহকর্মী মিঞা মুহাম্মদ শরীফ সাহেব এর সাহায্য ও সহায়তা দ্বারাও আমি অত্যন্ত উপকৃত হই। যদিও মিঞা মুহাম্মদ শরীফ সাহেব গত কয়েক বৎসর যাবৎ সক্রিয় ওকালতী কার্যে জড়িত ছিলেন, তখনকার নিয়ম অনুসারে জেষ্ঠ্যতায় আমি উপরে ছিলাম। আল্লাহ্ তাআলার অসীম অনুগ্রহে আমাদের তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর প্রচেষ্টা সাফল্যের মুকুট পরিধান করে।

বিভক্তির সময় জামা'তের একটি ক্ষুদ্র অংশ পৃথক হয়ে যায়; এবং তারা লাহোর শহরে সদর দপ্তর স্থাপন করে নিজস্ব সংগঠন তৈরী করে। তাদের মধ্যে একজন ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ছিলেন, যিনি ক্রমশ: মোটামুটি আরামদায়ক অবস্থা থেকে অধিকতর উচ্চ অবস্থার দিকে ধাবিত হন এবং আইনত: সন্দেহজনক কার্যাবলীতে জড়িত হয়ে পড়েন। ফলশ্রুতিতে তিনি একটি ফৌজদারী মামলায় সোপর্দ হন, গুরুতর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাকে দীর্ঘ মেয়াদে কারাবন্দির দন্ডাদেশ দেয়া হয়। দোষী সাব্যস্ত হওয়া ও দন্ডাদেশ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য হাইকোর্টে আপীল করা হয়, কিন্তু জামিন দেয়া হয় নাই, এবং আপীল চলাকালীন সময়ে আপীলকারীকে জেলে থাকতে হয়। পরবর্তী সময়ে এটাই তার নাজাত প্রাপ্তির কারণ হিসাবে প্রমাণিত হয়। তার জেলের জীবন এবং তার ঠিক পূর্ববর্তী জীবনযাত্রা তাকে তার নৈতিক মূল্যবোধ পুন:পরীক্ষা ও পুন:পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ যাচাই করতে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি মনে মনে তার পদক্ষেপসমূহ পুন:বিবেচনা করেন এবং পুনরায় প্রার্থনা ও অনুতাপের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার পথনির্দেশ ও সহায়তা কামনা করেন। তার এই মর্মবেদনার মাঝে তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) কে স্বপ্নে দেখেন এবং তাঁর কাছে জানতে চান, "হুযূর কখন আমি মুক্তির আশা করতে পারি?" প্রতিউত্তর ছিল, "যখন তোমার চামড়াও বদলাবে।" তিনি এটা এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, আল্লাহ্ তাআলা তার জীবনের পূর্ণ বৈপ্লবিক পরিবর্তন চান এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীতে প্রত্যাবর্তন চান। তিনি তা পূর্ণরূপে প্রতিপালন করার জন্য ও তারপর থেকে তার পছন্দকৃত পথে দৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও অবিচল থাকতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন। পরবর্তী সাক্ষাতের দিন যখন তার ছেলে তাকে দেখতে আসে, তিনি তাকে সবকিছু বর্ণনা করেন, এবং তাকে খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে তার আনুগত্য জ্ঞাপন করতে এবং তার মুক্তির জন্য দোয়া করার সবিনয় আবেদন জানাতে নির্দেশ দেন।

ঘটনাচক্রে প্রায় সেই সময় হযরত সাহেব (রা.) লাহোর পৌছান এবং যুবক ছেলেটি মরহুম শেখ মুশতাক হুসাইন সাহেবকে (আমাদের সম্মানিত ভ্রাতা শেখ বশীর

আহমদ সাহেব, যিনি কিছু আগ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টের একজন বিচারক ছিলেন, এর সম্মানিত পিতা) সাথে নিয়ে হুযূরের সাথে দেখা করতে আসে। সাক্ষাৎকারটির সময় আমিই একমাত্র বাইরের লোক উপস্থিত ছিলাম। হযরত সাহেব (রা.) যুবক ছেলেটির কথা পূর্ণরূপে শুনেন, এবং তার পিতার মুক্তির জন্য সকাতর ও বারবার আবেদনের উত্তরে মৃদুস্বরে সান্ত্বনাদায়ক বাক্য উচ্চারণ করেন, "আমি দোয়া করবো।" হযরত সাহেবের কণ্ঠস্বর ছিল ফিসফিসানির সামান্য উপরে এবং যা নির্দেশ করে যে, তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছেন। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, তাঁর দোয়া শোনা হবে এবং গৃহীত হবে। যদিও আইনজীবী হিসাবে আমি জানতে উৎসুক ছিলাম, কিভাবে সুনির্দ্দিষ্ট ফলাফল অর্জিত হবে।

মামলাটি পরিচালনার জন্য আমাকে নিয়োজিত করা হয় নি। কিন্তু আমি আপীলকারীকে চিনতাম এবং প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে কিছু জনশ্রুতি জানা ছিল। আপীল এর প্রধান-যুক্তি ছিল একটি আইন-সংক্রান্ত বিষয়। মামলার প্রধান সাক্ষী বিচারকালে তার বর্ণনায় যে অপরাধের জন্য অভিযুক্তকে দায়ী করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংযোগ তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হন। প্রথমে যে ম্যাজিষ্ট্রেট মামলাটির তথ্য নেন, তার কাছে ঐ সাক্ষীর পূর্ববর্তী বর্ণনায় ঐ সকল প্রয়োজনীয় সংযোগ তথ্য ছিল। বাদী পক্ষ বিচারকালে এ বিবরণ পেশ করে। আপীলকারীর দোষী সাব্যস্ত হওয়া প্রধানত ঐ বিবরণের উপর নির্ভরশীল ছিল।

জাস্টিস মি. পিটম্যান এর এজলাসে আপীলটি শুনানির জন্য উঠে। তিনি মত দেন যে, আপীলকারীর বিরুদ্ধে পূর্বের বিবরণ গ্রহণযোগ্য নয়, এবং যেহেতু অবশিষ্ট সাক্ষ্য তার দোষ সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়, তিনি (জাস্টিস মি. পিটম্যান) আপীলটি গ্রহণ করেন এবং দোষী সাব্যস্তকরণ রায়টি আইনত: অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করেন, এবং আপীলকারীকে খালাস প্রদান করেন।

এর কয়েক মাস পর ঐ একই পয়েন্ট আরেকটি মামলায় সিদ্ধান্তের জন্য একটি ডিভিশন-বেঞ্চে (দুইজন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত) আসে, যারা বিচারপতি মি. পিটম্যানের সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেন এবং মামলার সাক্ষ্য হিসাবে পূর্ববর্তী বর্ণনা গ্রহণযোগ্য বলে রায় দেন। অবশ্য এতে জাস্টিস মি. পিটম্যান কর্তৃক খালাসকৃত আপীলকারী কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্থ হননি।

ভদ্রলোক তার বেকসুর খালাসের পর চল্লিশ বৎসরের বেশী জীবিত ছিলেন। জেলে থাকা অবস্থায় তিনি যে প্রতিজ্ঞা করেন তা পূর্ণমাত্রায় প্রতিপালন করেন। অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক বৈপ্লবিক-পরিবর্তন সাধিত হয়, যা তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, যা জীবনের পরিপূর্ণ সময়ে গত বছর এসেছিল, বজায় রাখেন। যখন তার নতুন জীবন, যা আল্লাহ্‌কে দৃষ্টিতে রেখে সন্তুষ্টি ও বিনম্রতার সাথে যাপিত হয়, যা ছিল সঙ্গী-সাথীদের সেবায় নিয়োজিত, তার সাময়িক ত্রুটি-বিচ্যুতির সকল চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে মুছে দেয়, যার জন্য তিনি গভীর শান্তি পান এবং পরিশেষে যা থেকে তিনি আল্লাহ্ তাআলার অপার অনুগ্রহ ও করুনায় উদ্ধার পান। কঠিন প্রতিজ্ঞা যা তিনি করেন, পূর্ণরূপে প্রতিপালন করে আরও শক্তিশালী হয়ে আবির্ভূত হন।

তার আপীল কেসের শুভ ফলাফলের পর আমি তাকে মোটামুটি ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারি। এবং তার উপর যে পরিবর্তন এসেছে, তা দেখে বিস্মিত হই। প্রকৃতপক্ষে তিনি শিশুসুলভ ও প্রিয় স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। কোন প্রকার পাপের প্রতি তার সামান্যতম ঝোঁক ছিল না। সম্ভবত তিনি অজ্ঞতাবশত: হোঁচট খান, কিন্তু শীঘ্রই বুঝতে পারেন যে, তিনি যে পথে চলা শুরু করেছেন, তা সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা দেয় না, বরং নৈতিক ও আধ্যাতিক দেউলিয়াত্ব ঘটায়। ঐশ্বরিক দয়া ও অনুগ্রহে তিনি ঝাকি খেয়ে সাধুতা ও সততার পথে ফেরত আসেন এবং তিনি তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করেন। পরিশেষে তার সবকিছুই মঙ্গলময় হয়।

ডিউক অব উইন্সর, তখন প্রিন্স অব ওয়েলস এবং বৃটিশ রাজমুকুটের উত্তরাধীকারী (যা প্রকৃতপক্ষে তিনি কখনই পরিধান করেন নাই, কেননা তার সিংহাসন আরোহন-অনুষ্ঠানের পূর্বে এডওয়ার্ড অষ্টম হিসাবে সিংহাসন ত্যাগ করেন) ১৯২২ইং সনে ভারত ভ্রমণ করেন। তার লাহোরে অবস্থানকালীন সময়ে তাকে হযরত খলীফাতুল মসীহ দ্বিতীয় (রা.) এবং জামা'তের পক্ষ থেকে "এ প্রেজেন্ট টু দি প্রিন্স অব ওয়েলস" নামে একটি বই উপহার দেয়া হয়। বইটিতে জীবন্ত ধর্ম হিসাবে ইসলাম ধর্মের যৌক্তিক-ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয় এবং তাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে সমাপ্তি টানা হয়। হযরত সাহেব (রা.) মূল রচনা উর্দূতে লিখেন এবং উর্দূ পান্ডুলিপির একটি কপি আমাকে লাহোরে পাঠান, সাথে নির্দেশ ছিল যে, যত দ্রুত সম্ভব ইংরেজিতে অনুবাদ করে সংশোধনের জন্য যেন কাদিয়ান নিয়ে আসি। আমি পাঁচ সংখ্যায় অনুবাদ সম্পন্ন করে কাদিয়ান পৌঁছাই। রিভিশন বা সংশোধনের জন্য দু'দিন রাখা হয়। সংশোধনী বোর্ড হযরত সাহেব (রা.), মরহুম হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব, মৌলভী শের আলী সাহেব, এবং আমাদের সম্মানিত ভ্রাতা মাষ্টার মুহাম্মদ দ্বীন সাহেব সমন্বয়ে গঠিত ছিল। আমরা প্রত্যেকদিন ফজরের নামাজের পরপরই কাজ শুর করতাম, অর্থাৎ সূর্যোদয়ের এক ঘন্টা আগে থেকে শুরু করে এশার নামাজের অনেক পর পর্যন্ত কাজ করতাম, শুধুমাত্র নামায ও খাবার গ্রহণের সময়ে বাদ রাখতাম। মসজিদে মোবারকের ছাদে, উত্তরদিকে খোলা এমন একটি কক্ষে আমরা কাজ করতাম। সমস্ত খানা হযরত সাহেবের বাসা থেকে পাঠানো হতো। কেবলমাত্র নামাযের সময় আমরা রুমের বাইরে যেতাম এবং একে অন্যের থেকে পৃথক হতাম। আমাদের বৈঠক, এই সমস্ত প্রয়োজনীয় বিরতী বাদে, প্রতিদিন প্রায় ১৭ ঘন্টারও বেশী সময়ব্যাপী চলতো। আমি এ দুই দিনের চেয়ে অধিকতর পরিশ্রমময় এবং একই সাথে অধিকতর উদ্দীপনাময় ও অধিকতর পুরষ্কার সম্পন্ন দিনের কথা মনে করতে পারিনা।

কর্মরত দলটি ছিল সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এবং অনুপ্রেরণাদায়ক, যা আশা করা যেতে পারত। কাজটি ছিল যদিও কঠিন, অত্যন্ত শিক্ষামুলক এবং খাদ্য-পানীয় এর ব্যবস্থা যদিও সাধারণ, তথাপি অত্যন্ত প্রীতিকর এবং সন্তুষ্টিজনক। হযরত সাহেবের বড় মেয়ে, তখন অল্প বয়সের শিশু, খাবার-দাবার এর ব্যবস্থা দেখাশুনা করতো। তার প্রতারনাহীন গম্ভীর ভাব প্রত্যেক ক্ষেত্রে নির্মল মনোহারীতা ও স্বভাবগত সৌন্দর্য যোগ করতো। হযরত সাহেব যদিও তিনি প্রতিটি চলমান মুহূর্ত থেকে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাধিক নিংড়ে নিতে আগ্রহী ছিলেন, যা এর দিবার সামর্থ্য ছিল, প্রত্যেকের আরামের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। এবং তার নির্মল রসিকতাপূর্ণ মাধুর্য্যে শুধু আমাদের মনোবলকেই চাঙ্গা রাখে নাই, বরং হাতের কাজ দ্রুত করতেও সাহায্য করেছে। আমি দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করতে পারি যে, এবং আমি নিশ্চিত, এটা আমাদের প্রত্যেকের জন্য সত্য, প্রতি দীর্ঘদিন শেষে আমরা বের হয়ে আসতাম তরতাজা, আগ্রাহ্নিত ও উৎফুল্লভাবে, যেমন আমরা দিনের শুরুতে থাকতাম। প্রত্যেক সময়ই এই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটতো, যতবার আমি হযরত সাহেব (রা.) এর সাথে কাজ করার সৌভাগ্য

লাভ করেছি। তার দ্যুতিময় ব্যক্তিত্ব, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সতেজকারক ও শক্তিপ্রদ টনিক এর ন্যায় ফলপ্রদ ছিল। যারা তাঁর সাথে কাজ করতো, তাদের জন্য তার উৎকণ্ঠা গভীরভাবে হৃদয় স্পর্শ করে যেত।

চল্লিশ বছর পর হিজ রয়্যাল হাইনেস ডিউক অব উইন্ডসর এর সাথে আমার সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার হয়, যখন তাকে অনানুষ্ঠানিকভাবে নিউইয়র্কের জাতিসংঘের হেড কোয়ার্টার ঘুরিয়ে দেখানো হয়। আমি তাকে "এ প্রেজেন্ট টু দি প্রিন্স অব ওয়েলস" বইটির কথা উল্লেখ করি। তিনি তৎক্ষণাৎ তা স্মরণ করেন, এবং আগ্রহের সহিত নিশ্চয়তা দেন, "এটি এখনও আমার কাছে আছে।"

হযরত সাহেবের খেলাফতের প্রথম দিকে শীর্ষস্থানীয় একদল উলামা, যারা আহমদীয়া আন্দোলন বিরোধী প্রত্যেক ফের্কার প্রতিনিধিত্ব করতো, একই মঞ্চ থেকে বক্তৃতা করার জন্য কাদিয়ানে সমবেত হন। আহমদীয়া আন্দোলনের চূড়ান্ত মুলোৎপাটন তাদের লক্ষ্য বলে তারা পূর্বেই ব্যপক প্রচারণা করে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দিক দিয়ে যা এক অত্যন্ত কঠিন ও নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যেহেতু মিটিংগুলোতে আশেপাশের গ্রামগুলি হতে শত্রুভাবাপন্ন লোকজন জড়ো করার পরিকল্পনা ছিল। বক্তৃতাগুলি উস্কানিমূলক হতে পারতো, এবং তাদের একটি ঘোষিত-লক্ষ্য ছিল প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) এর পবিত্র মরদেহ কবর থেকে উত্তলন করা। তাদের কিছু উলামার দাবী ছিল, যদি তার নবুয়তের দাবী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তার মরদেহ স্বাভাবিক পচনক্রিয়া থেকে হেফাজত থাকবে। উলামাদের তথাকথিত বিশ্বাসের সামান্যতম সারবত্তা ছিল না। উক্ত মতবিশ্বাসটি উদ্ভাবন করা হয় শুধুমাত্র সম্ভাব্য পরিকল্পিত উচ্ছৃঙ্খলতা ও পবিত্র বস্তুর অসম্মানজনক ক্ষতিসাধন করার বাহানা হিসাবে। অপরপক্ষে এটা স্পষ্ট প্রতিয়মান ছিল যে অনুরূপ যে-কোন সন্ত্রাসী-প্রচেষ্টা প্রত্যেক আহমদী তার শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে প্রতিহত করবে। এই মর্ম-বিদীর্ণ' পরিস্থিতিতে প্রশাসনের সদিচ্ছার উপর বা এজন্য তাদের বিবেচনায় মোতায়েনকৃত লোকবলের পর্যাপ্ততার উপর বিশ্বাস রেখে খুব কমই ভরসা করা যেত। উলামাদের উদ্দেশ্য জানার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষনা করতে পারতো, কিন্তু তারা তা করেনি। হয় তারা পরিস্থিতি নিরূপনে ব্যর্থ হয়, অথবা তারা এর প্রতি নিস্পৃহ ছিল।

অত্যন্ত গুরুভার ও তীব্র-যন্ত্রণাদায়ক দায়িত্ব জামাতের উপর অর্পিত হয়, এবং তা জামাতের শ্রদ্ধেয় নেতার উপরই সবচেয়ে বেশী চাপ সৃষ্টি করে। আমি তখন লাহোরের আহমদীয়া হোষ্টেলের ওয়ার্ডেন (তত্ত্বাবধায়ক) ছিলাম। আমি হোষ্টেলের সকল আবাসিক ছাত্রসহ অবিলম্বে কাদিয়ান রওনা হওয়ার নির্দেশ পাই। জুম্মার নামাযের শেষে আমি প্রাপ্ত নির্দেশ ঘোষনা করি এবং ছাত্রদেরকে আমার সাথে সন্ধ্যার বাটালাগামী ট্রেনে উঠার জন্য অনুরোধ করি। ইউনিভার্সিটি পরীক্ষাসমূহ এগিয়ে আসছিল, এবং অর্ধেক সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষাগুলিতে অংশগ্রহণ করার কথা। কিন্তু একজনও আমার সাথে ট্রেনে চড়তে পিছপা হয়নি। হোষ্টেলের একজন বাসিন্দা শেখ আহমদ সাহেব ঐ দিনের জন্য তার বাড়িতে যায়। সে সন্ধ্যাবেলায় লাহোরে ফিরে আসে, রেলওয়ে স্টেশনে সহপাঠীদের দেখে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাদের কাছ থেকে কি করণীয় জানতে পারে। সে বাটালার একটি টিকিট ক্রয় করে আমাদের সাথে যোগ দেয়। ট্রেন মাঝরাতে বাটালা পৌঁছে। কিছু অল্পবয়েসী ছেলে ১১ মাইল দূরের কাদিয়ান রওনা হওয়ার আগে কয়েক ঘন্টা বিশ্রামের জন্য অনুরোধ করে। দু'একজনের মতে অবন্ধুসুলভ অঞ্চলের ভিতর দিয়ে অসমান বালুময় রাস্তায় যা কাদিয়ান পৌঁছেছিল, যাত্রা শুরু করার আগে দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা করা অধিকতর নিরাপত্তাজনক ও বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আমি ব্যাখ্যা করে বললাম যে, আমার কাছে নির্দেশ "অবিলম্বে"-কোন প্রকার দেরী করা সমর্থন করে না। আমরা অবিলম্বেই রওনা হই এবং ঊষার প্রথম প্রহরেই কাদিয়ান পৌঁছি। সেই সকালেও কাদিয়ান সতর্ক অবস্থায় ছিল। ফজরের নামায শুরু হয় এবং নামায সমাপ্তির পর আমাদেরকে বিভিন্ন কাজ এবং কর্মস্থল বন্টন করে দেয়া হয়।

দু'জন রিপোর্টার এবং অর্ধডজন কমবয়েসি ছেলে দ্বারা গঠিত একটি দলের চার্জে আমাকে দেয়া হয়। আমাদের কাজ ছিল মিটিংএ শেষাবধি উপস্থিত থাকা। যেহেতু উলামারা দলবেধে কাদিয়ানে সমবেত হয়েছিল, মিটিং প্রত্যেকদিন সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে আরম্ভ করে গভীর রাত পর্যন্ত চলতো। শুধু দুপুর ও সূর্যাস্তের পর নামায ও খাবারের জন্য দু'টি সংক্ষিপ্ত বিরতি থাকতো। একজন ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মুষ্ঠিমেয় কয়েকজন পুলিশও মিটিং এ কর্তব্যরত থাকতো। বক্তাদের অনিষ্টকর বা উত্তেজনামূলক বক্তব্যের প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার কাজের অংশ ছিল।

দু'টি বিরতির সময়ে হযরত সাহেব (রা.) এর নিকট আমার রিপোর্ট পেশ করার জন্য ফিরে আসতাম, দ্রুত কিছু খেয়ে নিতাম এবং বা-জামাত নামাযে যোগদান করতাম। মধ্যরাতের কিছুসময় পর হযরত সাহেব (রা.) সকল এলাকা ও ক্ষেত্র থেকে রিপোর্ট পেয়ে ও সেগুলি মূল্যায়ন করে তার পরামর্শ শুরু করতেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী জারী করতেন। অত:পর তিনি চেকপোষ্টসমূহ নিজে ঘুরে দেখতেন এবং সবকিছু ঠিক আছে কিনা দেখে সন্তুষ্ট হতেন। স্বাভাবিকভাবেই কবরস্থান ছিল মনযোগ ও দুশ্চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। তখনও কাদিয়ানের আবাসিক অঞ্চল বিক্ষিপ্তভাবে দীর্ঘ-এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। সুতরাং নিরাপত্তা ব্যবস্থাও বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট রাখতে হতো, বিশেষত: তথ্য-সংগ্রহ, পারস্পরিক যোগাযোগ ও সংযোগের উপর। আমাদের কোন লোকই উলামাদের মিটিং এর স্থানে যাবে না, যাতে কোন প্রকার সংঘর্ষজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। বিপদ-সংকেত বা সতর্ক বাণীর ক্ষেত্রে স্কাউটদেরকে তাৎক্ষনিকভাবে প্রত্যেক সেক্টরের চেকপোস্টে পাঠানো হতো নির্দেশাবলী পৌঁছনোর জন্য যা অবশ্যই সুবিবেচনার সাথে সুশৃঙ্খলভাবে ও সর্বাধিক দ্রুততায় পালন করা হতো।

হযরত সাহেব (রা.) এর ঘুরে দেখার সময় অন্যদের সাথে আমিও অনুমতি পাই তার সাথে থাকার জন্য। আমি অত্যন্ত অভিভূত হই শ্রদ্ধেয় দরবেশ ও উলামা-ব্যক্তি যেমন (মরহুম) কাজী আমীর হোসেন সাহেব, মরহুম মৌলভী শের আলী সাহেব এবং অনুরূপ আরও অনেককে দাঁড়িয়ে নির্দ্দিষ্ট পয়েন্টে ডিউটি করতে দেখে। সৈয়দ সারওয়ার শাহ সাহেব এর ডিউটি ছিল সদর আঞ্জুমানের ট্রেজারী (বাইতুল মাল) এর সামনে। কম বয়েসী বাচ্চা ছেলের মত সামান্য না ঝুকে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তার পাজামা হাটু পর্যন্ত উঠানো, বেল্টে একটি ছোরা ঢুকানো, শক্ত হাতে একটি লাঠি ধরা এবং তার চোখগুলি উজ্জ্বল এবং সর্বদাই সঞ্চারমান (আল্লাহ্ তাআলা তার ও অন্যসব পূণ্যাত্মা মহাপুরষদের প্রতি রহমত করুন)।

প্রথম রাতের চতুর্দিক পরিদর্শন রাত ৩-০০ টায় শেষ হয়। হযরত সাহেব নিরাপত্তা বলয় এর কিছু দুর্বল সংযোগস্থল চিহ্নিত করেন এবং সেগুলিকে শক্তিশালী করতে উদ্বিগ্ন ছিলেন। স্থানীয় জনবল ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণভাবে সমবেত ও ব্যবহার করা হয়েছিল এবং অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত ছিল। বাইরে থেকে সাহায্য প্রয়োজন ছিল। কাউকে অবশ্যই মৌখিক নির্দেশ সমূহ বহন করতে হবে এবং

কাছাকাছি অবস্থানের বিশ্বস্ত-অনুসারীদের তা পৌঁছাতে হবে। দু'একটি নাম প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু তারা যথোপযুক্ত বিবেচিত হয়নি। আমি সাহস করে আমার ছাত্রবাহিনীর একজন চৌধুরী বশীর আহমদ এর নাম পেশ করলাম। হযরত সাহেব (রা.) তাকে ডেকে পাঠান, নির্দেশাবলী জানান এবং আদেশ দেন যে, সে যেন তখনই ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়, মিশন সম্পন্ন করে এবং ফেরত এসে তাকে অবিলম্বে অবহিত করে। বশীর আহমদ তখনই কাদিয়ান ত্যাগ করে, ঘোড়ার পিঠে ৮ ঘন্টা সওয়ার থেকে সবার সঙ্গে যোগাযোগ করে, নির্দ্দেশ সমূহ পৌঁছায় এবং দুপুরের পূর্বেই কাদিয়ান ফেরত এসে তার রিপোর্ট পেশ করে।

যে সময়ে হযরত সাহেব (রা.) তাঁর প্রথম রাত্রির নির্দ্দেশ সমূহের উপর উপসংহার টানেন, এবং দোয়া ও প্রার্থনার জন্য পৃথক হন, তখন উষাকাল দ্রুত এগিয়ে আসছিল। আমি জানি না, তিনি একটুও ঘুমাতে পেরেছিলেন কিনা। আমি যা জানি তা এই যে, এই চাপা-উত্তেজনাপূর্ণ কঠিন পরিস্থিতি তিনদিন ও তিনরাত ব্যাপী বিস্তৃত ছিল। এবং তিনি যে কারও চেয়ে আগাগোড়া সতর্ক অবস্থায় ছিলেন --পর্যবেক্ষণ করে, বিবেচনা করে, পরিকল্পনা করে, উদ্ভাবন করে, আলোচনা করে, উপদেশ দিয়ে, অনুপ্রেরণা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, সাহস দিয়ে, এবং সর্বোপরি তার সমীপে দোয়া ও প্রার্থনা করে যার উপর তার সমস্ত আশা ও বিশ্বাস কেন্দ্রিভূত ছিল। দায়িতের চাপ ছিল অত্যন্ত ভারী এবং মনোবল চূর্ণকারী। তিনি তা পালন করেন সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে, কোন প্রকার পরাঙ্মুখ না হয়ে।

আমাদের মধ্যে যাদের সৌভাগ্য হয়েছিল, নিজেদের নগণ্য-সামর্থ্য সত্ত্বেও তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার, নি:সন্দেহে উদ্বিগ্ন ছিল, যাতে না আমাদের পক্ষ থেকে সামান্যতম ব্যর্থতা তাঁর দায়িত্বাবলীর উপর অনু পরিমাণও যোগ করে। প্রত্যেকে ব্যগ্র ছিল সর্বোচ্চ মানে কাজ সম্পন্ন করার জন্য, কিন্তু সামান্যতম অনুভূতিও ছিল না ক্লান্তি বা ভয়ের। এই রকম নেতা আমাদের নেতৃতে থাকায়, প্রত্যেক হৃদয় অনুপ্রাণিত হয় তাঁর প্রতি ভালোবাসায় তার জন্য, যার জন্য তিনি এবং আমরা সবাই দন্ডায়মান ছিলাম এবং পরস্পরের জন্য। একই উদ্দেশ্য, একই মূল্যবোধ, এবং নি:স্বার্থ ধার্মিকতা প্রত্যেকটা চলমান মুহূর্তকে মহামূল্য স্মৃতির ভান্ডারে পরিণত করে।

তাছাড়া সবার ভিতর এ সচেতনতা ছিল যে, আমাদের প্রিয় এবং অনুপ্রাণিত নেতা তার শক্তি খরচ করছেন শুধুমাত্র আহমদীয়া আন্দোলন ও জামাত এর নিরাপত্তার জন্য নয়, বরং একইভাবে জামাতের প্রধান দফতরে যারা জড়ো হয়েছে, তাদের নিরাপত্তা ও হেফাজতের জন্যও। যারা জমায়েত হয়েছে এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, আহমদীয়া আন্দোলন (বা এর কোন অনুসারীর) উপর কোন প্রকার ক্ষতি বা আঘাত হেনে তারা একটি মহৎ উদ্দেশ্য হাসিল করবে।তাদের কারও প্রতি তাঁর কোন প্রকার কুধারণা ছিল না, বরং প্রত্যেকের প্রতি শুধুমাত্র ভালোবাসা ছিল। তাদের অনেকে পরবর্তী সময়ে তাঁর প্রতি ভালোবাসা, আত্মোৎসর্গতা ও পূর্ণ আনুগত্যসহ আহমদীয়া আন্দোলনের কাতারে শামিল হন।

উদ্বেগপূর্ণ দিনগুলি পার হয়েছিল, কিন্তু তা আমাদের হৃদয়ে মহামূল্য স্মৃতি রেখে যায়। আমার অদম্য সাহসী ছাত্র সেনাদল আমার সাথে লাহোর চলে আসে। কাদিয়ানে তারা অধিকাংশ সময়ই কর্তব্যরত ছিল। মিঞা আতাউল্লাহ সাহেব সহ তাদের কেউ কেউ সর্বাধিক বিপদজনক অবস্থান এবং সেহেতু সর্বোচ্চ সম্মানের স্থানে যেমন প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) এর কবরস্থানে পাহারারত ছিল। তাদের কেউই তেমন একটা ঘুমাতে পারেনি। এইবার আমরা পায়ে হেটে বাটালা না যেয়ে স্প্রিংবিহীন, হাড় কাপানো, ঘটর ঘটর শব্দকারী ঘোড়ার গাড়িতে রওনা হই। যেমন প্রায়ই ঘটে একটা গাড়ি পথে উল্টিয়ে যায়, ফলে এর মহামূল্য আরোহীদের একজনের হাড় ভেঙ্গে যায়। তার জন্য ট্রেনে একটা বার্থ রিজার্ভ করা হয়, যাতে সে শুয়ে থেকে কিছুটা আরাম পেতে পারে।

অল্প ক'দিন পরেই বিশ্ববিদ্যালয়-পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। আমি আমার ছাত্র সেনাদলের যারা পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের ফলাফল নযরে রাখি। যার হাড় ভেঙ্গেছিল, সে সহ প্রত্যেকেই সসম্মানে পাশ করে। তাদের উপর আশীর্বাদ।

১৯২৪ইং সালের গ্রীষ্মকালে হযরত সাহেব (রা.) ইম্পেরিয়াল ইনষ্টিটিউট লন্ডনে অনুষ্ঠিত "এমপায়ার রিলিজিয়নস" এর কনফারেন্সে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমন্ত্রিত হন। তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তিনি একদল দরবেশ ও উলামা সংঙ্গে নিয়ে আসেন। যাদের ভিতর ছিলেন (মরহুম) সাহেবজাদা মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব, মরহুম হাফিজ রওশন আলী সাহেব, (মরহুম) মৌলভী জুলফিকার আলী খান সাহেব, (মরহুম) মৌলভী ফতেহ মুহাম্মদ সাইয়াল সাহেব, (মরহুম) শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব, মরহুম ভাই আব্দুর রহমান কাদিয়ানী সাহেব, ডা: হাশমাতুল্লাহ খান সাহেব এবং অন্যান্যরা। চৌধুরী মুহাম্মদ শরীফ সাহেব মন্টেগোরামীকে তার নিজ খরচে দলে যোগ দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়। মাষ্টার মুহাম্মদ দ্বীন সাহেবকে আমেরিকা থেকে ডেকে পাঠানো হয়। (মরহুম) আলহাজ্ব মৌলভী আব্দুর রহীম নাইয়ার লন্ডন মিশনের চার্জে ছিলেন।

আমি তখন ইউরোপে ছিলাম এবং আমাকে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দ্দেশ দেয়া হয়। একটি বাড়ি ৬ চেশহাম প্যালেস, দলের বাসস্থানের জন্য ভাড়া করা হয়। আমরা গাদাগাদি করে থাকতাম, সমস্ত ব্যবস্থা সর্বনিম্ন ও সবচেয়ে সাধারণ পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়। তা সত্বেও আমরা ছিলাম একটি সুখী ও উৎফুল্ল-দল।

হযরত সাহেব (রা.) এবং তাঁর সাথে যারা সঙ্গী ছিলেন, যাত্রাপথে প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়া পরিদর্শন করেন, এবং রোমেও সংক্ষিপ্ত যাত্রা-বিরতি দেন। হুজুর (রা.) এর দলকে তাদের আগমনে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য আমি আগেই লন্ডন পৌছি। এটা ছিল এক ঐতিহাসিক ভ্রমণ। গভীর অনুতাপের বিষয়, এর বিস্তারিত সঠিক বিবরণ এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি, যদিও এক পূর্ণ পুস্তক-খন্ডের জন্য প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রচুর বিষয় বস্তু পাওয়া যায়।

আমি এখানে একটি মাত্র প্রধান ঘটনায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবো। এটা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে হযরত খলীফাতুল মসীহ দ্বিতীয় (রা.) এবং অন্যান্য অনেক বিখ্যাত ও সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে কয়েক সপ্তাহ সময়ের জন্য নিবীড় সান্নিধ্যে থাকা মস্ত বড় একটা অনুগ্রহ ছিল। অনেক কিছুই ছিল দেখার এবং প্রচুর মাত্রায় নোট রাখার ও শেখার। একজনের মনে হতে পারতো, সে যেন ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত বিষয়ের আধ্যাত্মিক একাডেমীর সদস্য। সকল প্রকার বিষয় এবং সমস্যা সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক হয়ে উঠতো এবং আলোচিত হতো, বিতর্কিত হতো এবং অভিমত ব্যক্ত করা হতো। মাঝে মাঝে হযরত সাহেব (রা.) এবং মরহুম হাফিজ রওশন আলী সাহেব এর মাঝে আলোচনা হতো। মরহুম হাফিজ সাহেব সর্বদাই তার অবস্থান রক্ষা করার চেষ্টা করতেন এমন যুক্তির অকাট্যতা, স্পষ্টতা

এবং দৃঢ়তার সঙ্গে যে, বিষয়টির কোন দিকই অপরিক্ষিত থাকতো না। আলোচনার অগ্রগতিতে একটি প্রস্তাবের পক্ষে, স্পষ্টতা, সমর্থন বা খন্ডন করার জন্য জ্ঞান ও বিদ্যার ভান্ডার থেকে টেনে আনা বিবিধ যুক্তি প্রত্যক্ষ করা ও উপকার লাভ করা সত্যই এক বুদ্ধি-বৃত্তিক খাদ্য সরবরাহ তুল্য ছিল। প্রত্যেকেই এই বুদ্ধিদীপ্ত আলোকচ্ছটায় আনন্দ লাভ করতো। এটা ছিল এক অসাধারণ পারিতোষিক ও সমৃদ্ধিকরণ অভিজ্ঞতা, যা আগাগোড়া প্রাণবন্ত ছিল অকৃত্রিম বন্ধুতের মনোভাব, গভীর ভলোবাসা এবং আমাদের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় নেতার প্রতি আনুগত্য ও আত্মবিলীনতার সাধারণ বন্ধনে, যা আমরা সবাই হৃদয়ে পোষণ করতাম।

হযরত সাহেব (রা.) কনফারেন্সে পড়ার বক্তৃতার খসড়া উর্দূতে লিখেন। এবং আমি তা ইংরেজিতে অনুবাদ করার সুযোগ লাভ করি। যেদিন বক্তৃতাটি পড়া হবে, তার আগের দিন সন্ধ্যায় হযরত সাহেব এর উপস্থিতিতে আমাকে ডাকা হয়। তিনি আমাকে বলেন কনফারেন্সে বক্তৃতাটি কে পড়বে তা বিবেচনা করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন তাকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, তিনি নিজেই যেন বক্তৃতাটি পাঠ করেন, কিন্তু তিনি নিজেকে ইংরেজীতে এতটা দক্ষ মনে করেন না, বরং অপরিচিত শব্দাবলীর উচ্চারণ সম্বন্ধে এতটা নিশ্চিত নন। দু-একটি অন্য নামও প্রস্তাব করা হয়েছে, অতপর হযরত সাহেব (রা.) আমার মতামত জানতে চান। অত্যন্ত আদবের সাথে বিনীতভাবে আমি জানালাম যে, এ কাজে আমিই সর্বাধিক ভালো বাছাই হব। হযরত সাহেব (রা.) বললেন যে, বিষয়টি একটি পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারিত হওয়া উচিৎ। যাদের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে এমন দুই বা তিনজনকে বলা হলো বক্তৃতা পত্রের কিছু অংশ জোরে পড়ার জন্য। প্রত্যেকের দক্ষতার গুণাবলী সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য কয়েকজনকে বাসাটির উপর ও নীচে বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত করা হলো, মধ্যবর্তী দরজাসমূহ খোলা রাখা হলো শোনার জন্য। আমার স্মরণ আছে যে, মরহুম সাহেবজাদা মির্যা শরীফ আহমদ (রা.) সাহেবের রিপোর্ট আমার পক্ষে ছিল, যদিও তিনি আমার গলায় সামান্য রুক্ষতা লক্ষ্য করেছেন। হযরত সাহেব একমত হলেন, এবং এরূপে আমাকে বক্তৃতাটি পাঠ করার সম্মান প্রদান করা হয়। এই শর্তে যে, কোন প্রকার স্বরভঙ্গ যাতে প্রকাশিত না হয়, তা নিশ্চয়তার জন্য ডা: হাশমাতুল্লাহ খান সাহেব চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।

ডাক্তার সাহেব তার দায়িত্বাবলী এত সিরিয়াস ভাবে নিলেন যে, তিনি আমার নিরীহ গলায় কড়া বিতৃষ্ণাকারক আরক দ্বারা শক্তি সম্পন্ন চিত্রকল্প শুর করলেন, যার প্রতি প্রয়োগ আমাকে অসুস্থতার প্রান্তে নিয়ে আসে। পরবর্তী সকালের নাস্তার সময়ের ভিতর আমি তিন-চার বার এসব প্রবল সেবা ভোগ করেছি। সকালের নাস্তার সময় আমি হযরত সাহেব (রা.) কে এই শাস্তি জারি থাকার বিরদ্ধে অনুনয় করতে বাধ্য হলাম। প্রকৃতপক্ষে আমার গলা এইসব তীক্ষ্ণ সতর্কতামুলক চিকিৎসার জন্য কর্কশ হতে শুর করেছে। আমার অভিযোগ হযরত সাহেব (রা.) এবং টেবিলের সবাই প্রবল হাস্য সহকারে গ্রহণ করেন -- ডা: সাহেব নিজেও বাদ ছিলেন না। আমার আরও শাস্তি অনুগ্রহপূর্বক মওকুফ করা হয়।

ইমপেরিয়াল ইনস্টিটিউট এর প্রধান সভাকক্ষে গবেষণা-পত্রটি পড়া হয়। রেকর্ড পরিমান শ্রোতা উপস্থিত হন, প্রত্যেক সিটই পূর্ণ ছিল, এবং বহু সংখ্যক লোককে ভবনের বর্ধিত-অংশ, হলের পিছনের অংশ এবং প্রধান করিডোরের নিম্নাংশে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আমার সময় আসলো, এবং আমি মঞ্চের উপর উঠলাম। আমার গলা শুকিয়ে যায় এবং আমি বিচলিত বোধ করতে শুর করি। হযরত সাহেব মঞ্চের পাশেই বসে ছিলেন। ঠিক যখন আমি পড়া শুরু করবো, তিনি একটু ঝুকে আসলেন, এবং এমন স্বরে, যার মধুরতা ও নম্রতা তৎক্ষণাৎ অস্থিরতা প্রশমন কারক ও উৎসাহব্যঞ্জক, বললেন, "উদ্বিগ্ন হয়ো না, আমি দোয়া করতে থাকবো।" এই অত্যন্ত স্নেহশীল আচরণ আমাকে পূর্ণরূপে দুশ্চিন্তামুক্ত করে, এবং আমি আমার কাজ আত্মবিশ্বাসের সাথে করতে পারি। গবেষণা- পত্রটি গভীর মনোযোগের সাথে শোনা হয়।

যে মুহূর্তে গবেষণা পত্রটি পড়া শেষ হল, লোকজন হযরত সাহেব (রা.) কে সম্ভাষণ ও অভিন্দন জানানোর জন্য মঞ্চের দিকে ছুটে আসে। আমি মঞ্চ থেকে নেমে একপাশে দাঁড়ালাম। এডওয়ার্ড-৭ম দাড়ীধারী এক ভদ্রলোক, যিনি পড়ার সময় হলের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমার সাথে সহৃদয়তার সাথে হ্যান্ডশেক করেন এবং বলেন, "আমি কানে কিছুটা কম শুনি, এবং পিছন দিকে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি এবং বিশুদ্ধ আঠার শতাব্দির ইংলিশ কেবল আধুনিক নির্বোধ শব্দ তাতে ছিল না।" আমি এতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই।

ভেনিস থেকে বোম্বে ফেরত যাত্রার সময়, হযরত সাহেব (রা.) যিনি প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন, দলের অবশিষ্ট লোক যাদের অধিকাংশই ডেকে ভ্রমণ করেন, তাদের সাথে তাঁর অধিকাংশ সময় কাটান। ডেকের উপর চাঁদোয়া টাঙ্গিয়ে একটি আরামদায়ক ব্যবস্থা করা হয়। এক স্নিগ্ধ বাতাসময় সন্ধ্যায়, যখন চাঁদ তার রূপালী মায়া ঢেউ এর উপর ছড়িয়ে দিয়েছিল, আমরা উপরের একটি ছোট ডেকে একত্রিত হই। হযরত সাহেব এর প্রস্তাব মোতাবেক, প্রত্যেকে শুধুমাত্র আমি বাদে, একটি করে কবিতা আবৃত্তি করেন। উপসংহারে আমরা হযরত সাহেব (রা.) কেও কবিতা আবৃত্তি করার বিনীত অনুরোধ করি। কিছুটা দ্বিধার পর তিনি সম্মতি দেন এই শর্তে যে, আমরা তার চারদিকে ঝুকে আসবো, কেননা তিনি তার স্বর উঁচু করবেন না, যাতে তিন ফুটে দূরত্বের বেশী শব্দ না যায়। সুতরাং আমরা তার চারদিকে ঘেষাঘেষি করে দাঁড়ালাম, এবং তিনি নিচু এবং আবেগ-পরিপূর্ণ গলায় গালিবের একটি গযল আবৃত্তি করেন।

যখন সেই মিষ্ট এবং অতি প্রিয় কণ্ঠস্বর এর শেষ চলমান কম্পন মৃদু বাতাস ভাসিয়ে নিয়ে যায়, আমরা পুনরায় নিজেদের ভিতর ফিরে আসলাম, যেন কোন সম্মোহন থেকে মুক্ত হলাম। প্রত্যেক চোখ ছিল সজল এবং প্রত্যেক হৃদয় থেকে দীর্ঘশ্বাস বের হয়। কেউ কোন শব্দ উচ্চারণ করেনি। প্রত্যেকে যা অনুভব করে, শব্দের তা সামর্থ্য ছিল না প্রকাশ করার। একটি পবিত্র অভিজ্ঞতার স্মৃতি সযত্নে লালন করে, শ্রদ্ধা মিশ্রিত নিরবতায়, আমরা নিচে নেমে আসলাম।

সেটা ছিল প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার ঘটনা, অনুরূপ প্রণোদনাদায়ক ঘটনা অনেক পৃষ্ঠাব্যাপী লেখা যেতে পারে, কিন্তু সময় ও স্থান থামার জন্য বলে। তাছাড়া হৃদয় যে আনন্দ লাভ করেছিল সদয় স্নেহের সচেতনতায়, চোখ যা অভ্যস্ত ছিল আলোক বিচ্ছুরণকারী মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করায়, কান যা অভ্যস্ত ছিল স্ফুরিত কণ্ঠস্বরের মাতালকারী সংগীত ঘন্টার পর ঘন্টা শ্রবন করায় সংকোচ বোধ করে এবং প্রতিবাদ করে তাদের পবিত্র এবং মর্মস্পর্শী স্মৃতিকথা অত্যন্ত অপরিমিতভাবে প্রকাশ করতে, তাদের প্রতি যারা তাকে জানেনা, যেরূপ এরা জেনেছে।

['রিভিউ অব রিলিজিয়নস' ফেব্রুয়ারি ২০০৮ সংখ্যা থেকে অনুদিত]

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর শৈশবকালের গুটি কয়েক ঘটনা

হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ আল মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর ন্যায় প্রতিশ্রুত-ব্যক্তিদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অন্যদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকে। তাদের কর্মকান্ড, চালচলনের মাঝে খোদা তাআলার সাহায্যের স্পষ্ট ছাপ দৃষ্টিগোচর হয়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর জন্ম হয়েছিল ইসলামের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ। তাঁর জীবনী পাঠে মনে হয় তাঁকে লালন পালনের ভার যেন স্বয়ং খোদা তাআলা গ্রহণ করেছিলেন। নিম্নে তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের শৈশবকালের গুটি কয়েক ঘটনা উপস্থাপন করা হলো।

শৈশবের প্রাথমিক দিনগুলো : তাঁর জন্ম ১২ জানুয়ারী ১৮৮৯ সালে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ঔরসে হয়। তাঁর আকীকা ১৮ জানুয়ারী ১৮৮৯ সালে শুক্রবারে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তাঁর মা বাবার বড়ই আদরের সন্তান ছিলেন। তাই তাঁর তরবিয়তের প্রতি তাঁরা খুবই সচেতন ছিলেন। তিনি (রা.) শৈশবকাল থেকেই ভীষণ মেধাবী ছিলেন। একদা তিনি তাঁর খেলার সাথীদের সাথে খেলছিলেন। খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আদুরে সুরে বললেন, "মিঞা! আপনি খেলছেন"? হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) উত্তরে বলেন, "বড় হলে আমিও কাজ করব"। তখন তাঁর বয়স চার বছর ছিল। তিনি (রা.) ঘরে বল, ইত্যাদি দিয়ে খেলতেন, আর বাইরে তিনি গুলাইল দিয়ে নিশানা ভেদ, নৌকা চালনা, সাতরানো, ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

তাঁর শৈশবকাল এবং পিতা-মাতার তরবিয়ত দান : এমন সত্তা যারা, খোদা তাআলার সাহায্য এবং ওয়াদার ভিত্তিতে জন্ম গ্রহণ করেন, তাদের অতি উজ্জল ভবিষ্যতের কিছু ঝলক শৈশবকালেই মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হয়, যা দেখে বিচক্ষণ ও বিজ্ঞজনেরা অনুধাবন করতে পারেন যে, ভবিষ্যতে এমন শিশুরা আধ্যাত্মিকতার উঁচু মাকামে বিচরণ করবেন।

এক চমৎকার রাতের বিবরণ : এই ঘটনা খুবই ছোট বয়সের। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর এক জালীলুল কাদার সাহাবী হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লুধিয়ানায় অবস্থান গ্রহণ করেন। আমি সেখানে ছিলাম। মাহমুদের বয়স প্রায় তিন বছর ছিল। গ্রীষ্মকাল ছিল। অন্দর মহল ও অতিথিশালার মাঝে প্রতিবন্ধক কেবল একটি দেয়াল ছিল। মধ্যরাতে ঘুম ভাঙলে আমি মাহমুদের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন। হযরত (আ.) তাকে কোলে নিয়ে পায়চারী করছিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই শান্ত হচ্ছিল না। পরিশেষে তিনি (আ.) বলেন, "দেখ মাহমুদ, কত সুন্দর তারা (নেক্ষত্র)!" ছোট শিশু সেদিকে তাকায়। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বাহানা ধরে চিৎকার শুরু করে বলতে থাকে, "আব্বু তারায় যাব"।

আমি ভীষণ মজা পেলাম। তিনি (আ.) তাঁর সঙ্গিনীকে বললেন, "আমি শান্ত করার জন্য একটি পথ বের করলাম, কিন্তু সে এতেও নতুন বায়না ধরে"। পরিশেষে ছোট শিশু কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে নিজেই চুপ হয়ে যায়। কিন্তু এতো দীর্ঘ সময়েও তাঁর (আ.) মুখ থেকে কঠোর বা অনুযোগের কোন বাক্য বের হয়নি। (সীরাত মসীহ্ মাওউদ)

এই বর্ণনা থেকে আমাদের সামনে মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর অনিন্দ-সুন্দর চরিত্রের একটি দিক ফুঠে ওঠে যে, তিনি (আ.) শিশুদের প্রতি কত স্নেহপরায়ণ এবং কত সহিষ্ণু ছিলেন।

অনুরূপ, হযরত মৌলবী আব্দুল করীম (রা.) আরো একটি বর্ণনা করেন, মাহমুদের বয়স চার বছর ছিল। হুযূর (আ.) বরাবরের মত ঘরের ভিতর লিখছিলেন। মাহমুদ দিয়াশলাই নিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন। তার সাথে শিশুদের একটি দল ছিল। কিছুক্ষণ তারা পরস্পর খেলাধূলা করে। তারপর হঠাৎ মনের খেয়ালবশত: হযরত সাহেব (আ.) এর পান্ডুলিপিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে খুশিতে তালি বাজানো শুরু করে। হযরত (আ.) লেখায় গভীরভাবে মগ্ন ছিলেন। মাথা উঠিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করলেন না যে, কি হচ্ছে। ততক্ষণে মূল্যবান পান্ডুলিপি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুন নিভে গেলে বাচ্চারা অন্য খেলায় লিপ্ত হয়। হযরত সাহেব (আ.) প্রবন্ধের বিষয়বস্তু মিলিয়ে দেখার জন্য পূর্ববর্তী পান্ডুলিপির প্রয়োজন হয়। তাকে (মাহমুদ) এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে সে মুখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্য এক শিশু বলে ওঠে, "মিঞা সাহেব কাগজ জ্বালিয়ে দিয়েছেন।" মহিলারা এবং বাড়ীর অন্যান্য সকলে শংকিত, এখন কি হবে! হযরত সাহেব (আ.) এর মুচকি হেসে বলেন, ভালই হয়েছে, হয়ত তাতে আল্লাহ্ তাআলার বড় কোন কল্যাণ নিহিত আছে। এখন তিনি চাইলে আমাকে এর চেয়ে উত্তম কোন বিষয়বস্তু বুঝার তৌফিক দিবেন (সীরাত মসীহ্ মাওউদ)।

এক নিষ্ঠাবান-সাহাবী ফযল শাহ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বৈঠকখানার উঠানে বসে ছিলেন। সামনে বাদাম রাখা ছিল। আমি বাদামের খোসা ছাড়াচ্ছিলাম। এমন সময় হযরত মিঞা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.), তখন তাঁর বয়স চার পাঁচ বছর ছিল, আসলেন এবং সব বাদাম নিয়ে পকেটে পুরা আরম্ভ করলেন। হযরত আকদাস (আ.) এটি দেখে বললেন, এই ছেলে খুব ভালো। সব নিবে না, একটি দু'টি নিয়ে বাকীগুলো রেখে দিবে। হযরত সাহেব (আ.) একথা বলার সাথে সাথে তিনি সব বাদাম আমার সামনে রেখে দিলেন। কেবল এক দু'টি বাদাম নিয়ে চলে গেলেন। (সাওয়ানেহ ফজলে ওমর ১ম খন্ড)

এখানে আরও একটি ঘটনা উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি, যার দ্বারা এই মহান শিশুর খুরধার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে। একবার তিনি ঘরে অন্য এক ছেলের সাথে খেলছিলেন। তখন তাঁর বয়স নয় বছর ছিল। খেলতে খেলতে তিনি একটি বই পেলেন, যাতে লিখা ছিল- জিব্রাঈল এখন নাযিল হন না। তিনি (রা.) বললেন, "একথা ভুল, আমার বাবার প্রতি জিব্রাঈল নাযিল হন"। সেই ছেলেটি বলল, "না, জিব্রাঈল এখন

পৃথিবীতে আসেন না। কেননা, কিতাবে তাই লেখা আছে"। দুজনই নিজ নিজ কথায় অটল রইল। সেই ছেলেটি বলছিল, এখন জিব্রাঈল আল্লাহ্‌র বার্তা নিয়ে আসেন না আর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলছিলেন, না, আসেন। পরিশেষে তারা দু'জন হুযূর (আ.) এর কাছে গেলেন এবং নিজেদের দ্বন্দ্বের কথা উপস্থাপন করলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন, "এই বইয়ে ভুল লেখা আছে। জিব্রাঈল এখনও অবতীর্ণ হন।" এসমস্ত ছোট ছোট ঘটনাবলী দ্বারা তাঁর (রা.) শৈশবের অসাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ঘটে।

কোন এক উপলক্ষে তিনি (রা.) বলেন, আমি জেনে শুনেই বলছি, আমি হযরত সাহেব (আ.)কে আমার পিতা হওয়ার খাতিরেই মান্য করিনি। বরং আমার বয়স যখন প্রায় এগার বছর, তখন আমি দৃঢ়-সংকল্প করেছিলাম আমার গবেষণায় যদি তিনি নউযুবিল্লাহ্ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হন, তাহলে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু তাঁর সত্যতা আমার সামনে বিকশিত হয়েছে আর আমার ঈমান দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন, আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হলো। (আল ফযল ৬ জুন ১৯২৪)

শৈশবে ইলহাম – হযরত সৈয়্যদ সারোয়ার শাহ সাহেব (রা.), যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাহাবীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন, আর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর শিক্ষক ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) আমার কাছে পাঠ গ্রহণ করতেন। একদিন আমি বললাম, মিঞা! আপনার শ্রদ্ধেয় পিতা তো প্রচুর ইলহাম লাভ করেন। আপনিও কি ইলহাম লাভ করেন আর স্বপ্ন ইত্যাদি দেখেন? মিঞা সাহেব বলেন, মৌলবী সাহেব! স্বপ্ন তো অনেক দেখি। আর একটি স্বপ্ন তো আমি প্রায় প্রতিদিন দেখি। যখনই আমি বালিশে মাথা রাখি, তখন থেকে শুরু করে সকাল পর্যন্ত এই দৃশ্যই দেখি যে, এক বৃহৎ সৈন্য বাহিনী, যার পরিচালনা আমি করছি। আর কখনও কখনও এমন দেখি যে, সমুদ্র অতিক্রম করে শত্রুর মোকাবেলা করছি। আবার কখনও এমনও দেখেছি যে, সমুদ্র অতিক্রম করার জন্য কোন উপকরণ না পেলে নল খাগড়া জাতীয় বস্তু দিয়ে নৌকা তৈরী করে সমুদ্র অতিক্রম করে আক্রমণ পরিচালনা করছি। সারোয়ার শাহ সাহেব বর্ণনা করেন, যখন আমি তার মুখ থেকে এই স্বপ্নের কথা শুনলাম, তখন থেকে আমার হৃদয়ে এই বিষয়টি প্রোথিত হলো যে, এই ব্যক্তি অবশ্যই কোন এক সময় জামাতের নেতৃত্ব দিবেন। এ কারণে আমি ক্লাসে তাঁকে পাঠদান থেকে বিরত থাকতাম। তাঁকে আমার চেয়ারে বসাতাম আর আমি তাঁর স্থানে বসে তাঁকে পড়াতাম। আর আমি তাঁর স্বপ্ন শুনে তাঁর নিকট মিনতি করে ছিলাম, মিঞা! আপনি বড় হয়ে আমাকে ভুলে যাবেন না। আমার প্রতিও সদয় দৃষ্টিপাত করিয়েন। (সাওয়ানেহ ফযলে ওমর ১ম খন্ড)

হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বর্ণনা করেন, হুযূর (রা.) এর শৈশবকালের ইলহাম সম্পর্কে তাঁর এক পুরনো খেলার সাথী উল্লেখ করেন, তাঁর (রা.) শৈশবকালে, যখন তিনি তালিমুল ইসলাম মাদ্রসাতে আমার সাথে পড়তেন, তাঁর (রা.) ওপর এই ইলহাম হয় যে, "জায়েলুল্লাযীনাত্ তাবাউকা ফাউকাল্লাযীনা কাফারু ইলা ইয়াওমিল কিয়ামাহ্"। তিনি আরো উল্লেখ করেন, তিনি (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর খেদমতেও এই ইলহামের কথা পেশ করেছিলেন।

অল্প বয়সেই তিনি খোদা দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। লন্ডনের মসজিদ তৈরীর চাঁদার তাহরীক করার সময় এক জুম্মার খোতবায় তিনি খোদা দর্শনের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমি আজ পর্যন্ত তিন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার মুহূর্তে খোদার দর্শন লাভ করেছি। সর্বপ্রথম আমার শৈশবকালে লাভ করেছিলাম। সেই সময় আমার ধ্যান ধর্ম শেখা এবং ধর্মের সেবার প্রতি নিবদ্ধ হয়েছিল। তখন খোদার দর্শন লাভ হয়েছিল। আর আমাকে হাশর ও নাশরের সমস্ত দৃশ্য দেখানো হয়েছিল। এটি আমার জীবনে বড় বিপ্লব সংঘটিত করেছিল। (সাওয়ানেহে ফযলে ওমর, ১ম খন্ড, পৃ: ১৫৩)

হয়তবা স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও বুঝতে পেরেছিলেন, এই শিশুর সাথে খোদা তাআলার বিশেষ সম্পর্ক কম বয়সেই সৃষ্টি হয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, ক্লার্কের মোকদ্দমার দিনগুলোতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অন্যদের দোয়ার জন্য বলেন, সাথে আমাকেও বলেন, দোয়া আর ইস্তেখারা কর। তখন আমি রুইয়াতে দেখলাম আমাদের ঘরের চারপাশে পাহারাদার নিযুক্ত আছে। আমি ভিতরে প্রবেশ করে সিড়ির কাছে গেলাম, যেখানে ভূ-গর্ভস্থ ঘর আছে। আমি দেখলাম, সেখানে হযরত সাহেবকে দাঁড় করিয়ে চারপাশে গোবরের জ্বালানি রাখা হয়। আর সেগুলোর উপর কেরসিন তেল ঢেলে আগুন লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু দিয়াশলাই দিয়ে আগুন লাগানো হলেও আগুন প্রজ্জ্বলিত হয় না। তারা বারংবার আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সফল হয় না। আমি এই দৃশ্য দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হলাম। তবে আমি যখন দরজার চৌকাঠে দৃষ্টি দিলাম, সেখানে লিখা ছিল, "যিনি খোদার বান্দা হন, তাঁকে কোন আগুন ভস্মিভূত করতে পারে না।"

খোদার স্মরণে আত্মহারা – তিনি শৈশবকাল থেকেই খোদার স্মরণে নিমগ্ন থাকতেন আর ইসলাম ও আহমদীয়াতের জন্য প্রচুর দোয়া করতেন। শৈশবেই তার ভিতর ইবাদতে ইলাহীর স্বাদ সৃষ্টি হয় এবং কম বয়সেই মধ্য রাতের ইবাদতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। অনেক বর্ণনা থেকে জানা যায় তিনি পাঁচওয়াক্ত নামায ছাড়াও নামাযে তাহাজ্জুদ বিনা ব্যতিক্রমে আদায় করতেন। তার নামায আদায় কেবল প্রথাগত ও বাহ্যিক ছিল না। বরং তিনি বড় বিচলিত-চিত্তে ভীতি সহকারে, কাতরতার সাথে নামায আদায় করতেন। মকাররম শেখ গোলাম আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, 'একবার আমি ইচ্ছা পোষণ করলাম, আজ রাত আমি মসজিদে মোবারকে কাটাবো আর একাকিত্বে নিজ মওলার কাছে যা-ইচ্ছা তাই চাইবো। কিন্তু মসজিদে প্রবেশ করেই দেখি এক ব্যক্তি মসজিদে লুটিয়ে পড়ে কাতর স্বরে অনুনয় বিনয় করে দোয়া করছে। তার কাতরতার কারণে আমি নামায পড়তে পারলাম না। সেই ব্যক্তির দোয়ার প্রভাব আমার উপরে বিস্তার লাভ করে। আমিও দোয়াতে রত হয়ে গেলাম, হে প্রভু! এই ব্যক্তি তোমার কাছে যা কিছু চাইছে তুমি তাকে দান কর। এই ব্যক্তি মাথা তুললে জানতে পারবো, এই ব্যক্তি কে, এ-আশায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আর আমি জানিও না যে আমার কত পূর্বে এই ব্যক্তি মসজিদে এসেছে। যখন তিনি (রা.) মাথা উঠালেন আমি অবাক হয়ে দেখলাম, তিনি হযরত মিঞা মাহমুদ আহমদ সাহবে। আমি আসসালামু আলাইকুম বললাম। মুসাফাহ করলাম আর বললাম, মিঞা! আজ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কি নিয়ে নিয়েছ? তিনি বললেন, "আমি তো এটিই চেয়েছি, 'প্রভু আমার! আমাকে আমার চোখে ইসলামকে জীবিত করে দেখাও"। একথা বলে তিনি ভিতরে চলে যান। (আল ফযল-১৯৬৮)

(বদর কাদিয়ান, ৯-১৬ ফেব্রুয়ারি-২০০৬ অবলম্বনে)

রশিদ আহমদ
[জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর শিক্ষার্থী]

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) আল মুসলেহুল মাওউদ

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

হযরত মসীহ মাওউদ ইমাম মাহদী (আ.) এর সুযোগ্য পুত্র হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলীফা ছিলেন। তিনি (রা.) ছিলেন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সত্যতার এক জ্বলন্ত নিদর্শনস্বরূপ। তাঁর (রা.) জন্মের পূর্বেই এই সন্তানের জন্ম সম্পর্কে তিনি (আ.) খোদার কাছ থেকে বিশেষ শুভ সংবাদ লাভ করেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর উপর একটি ইলহাম হয়– '' তেরি উকদাকুশী হুশিয়ারপুর মে হোগি।'' অর্থাৎ– তোমার সমস্যাবলীর সমাধান হুশিয়ারপুরে নিহিত রয়েছে। ১৮৮৫ সনের শেষের দিকে হযরত আকদাস (আ.) একাকীত্বে ৪০ দিন পর্যন্ত ইবাদত করার মানসে তাঁরই ভক্ত এক রইস জমিদারের মাধ্যমে নির্জন বাগান বাড়িতে চিল্লাকশী করার নিয়ত করলেন। বাড়ির নিচ তলায় আবদুল্লাহ সানওয়ারী, শেখ হামেদ আলী ও মির্যা ফতেহ খাঁ এই তিনজনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল।

১৮৮৬ সনের ২২শে জানুয়ারী মাসে তিনি হুঁশিয়ারপুর পৌঁছেন। ঐ তিন সঙ্গীকে যার যার কর্তব্য কর্ম নির্ধারণ করেছিলেন। দোতলায় হুযূর (আ.)-এর খাদ্য পৌঁছে দেবার সময়ও সম্পূর্ণ নিরব থাকতে বলা হয়েছিল। দোতলায় হুযূর (আ.) একা নামায পড়বেন এবং নীচের তলায় সাহাবাগণ নামায পড়বেন বলে স্থির হলো। রইস শেখ মেহের আলী সাহেব জুমুআর নামাযের জন্য পূর্ব হতে একটি পরিত্যক্ত অনাবাদী নির্জন মসজিদ নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। জুমুআর দিন হুযূর (আ.) নামায পড়াতেন এবং সহচর তিনজন ছাড়া অন্য কেউ ঐ মসজিদে আসতেন না। এভাবে দিন রাত ৪০ দিন পর্যন্ত দোয়া রত থেকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আল্লাহর কাছ থেকে অনেক মূল্যবান ও শুভসংবাদবাহী সুসংবাদ প্রাপ্ত হলেন।

১৮৮৬ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারি একটি ইশতেহার প্রচার করেন। উল্লেখ্য এর নাম সবুজ ইশতেহার নয়। ১লা ডিসেম্বর ১৮৮৮ তারিখে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন যার নাম ছিল সবুজ ইশতেহার। হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর সত্যতার একটি নিদর্শন স্বরূপ রাসূলে করীম (সা.) ইরশাদ করেছিলেন যে, শেষ যুগে উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় আগমণকারী প্রতিশ্রুত মসীহ মাওউদ বিবাহ করবেন এবং তার সন্তানও হবে। এই হাদিসের তাৎপর্য হচ্ছে, তার বিবাহ এবং সন্তান লাভ উভয়ই নিদর্শন স্বরূপ হবে। ঐ ইশতেহারে হযরত আকদাস (আ.) তাঁর ৪০ দিনের দোয়া কবুলিয়তের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এই শুভসংবাদ সমূহে তাঁর ঔরসে বিশেষ এক সন্তান লাভ এবং উক্ত সন্তান দ্বারা সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের সূত্রপাত হওয়ার ইঙ্গিত ছিল। এর জরুরী ও প্রধান অংশগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো। সেই ইশতিহারে বলা আছে–

মহান ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী :

 হযরত আকদাস (আ.) বলেন, পরম করুণিক, পরম দাতা মহিমান্বিত খোদা যিনি সর্বশক্তিমান– যাঁর মর্যাদা মহাগৌরবময় এবং নাম অতীব মহান, আপন ইলহাম দ্বারা সম্বোধনপূর্বক বলেন, আমি তোমাকে এক করুণার নিদর্শন দিতেছি। তুমি যেভাবে আমার নিকট চাহিয়াছ তদনুযায়ী আমি তোমার সকরুণ নিবেদনসসূহ শুনিয়াছি এবং তোমার দোয়াসমূহকে করুণা সহকারে কবুল করিয়াছি এবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর ও লুধিয়ানায়) তোমার জন্য কল্যাণময় করিয়াছি। সুতরাং শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হইয়াছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হইতেছে।''

নিদর্শনের উদ্দেশ্য :

"খোদা বলিয়াছেন, যাহারা জীবন প্রত্যাশী তাহারা যেন মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তি লাভ করে। যাহাতে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ তাআলার কালামের মর্যাদা লোকের নিকট প্রকাশিত হয় এবং সত্য উপার যাবতীয় আশিসসহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা উহার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে এবং মানুষ বুঝে যে, আমি সর্বশক্তিমান যাহা ইচ্ছা করি, করিয়া থাকি এবং যেন তাহাদের প্রতীতি জন্মে যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং যাহারা অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম এবং কেতাব এবং তাঁহার রসূল পাক মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) কে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করিয়া থাকে, তাহারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন প্রাপ্ত হয় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিস্কার হয়।"

মুসলেহ মাওউদের অসাধারণ গুণাবলী ও কার্যাবলী :

"সুতরাং তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেওয়া হইবে। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করিবে। সেই পুত্র তোমারই সন্তান হইবে। সুশ্রী, পবিত্র পুত্র, তোমার মেহমান আসিতেছে। তাহার নাম আনমুয়ায়েল এবং সুসংবাদদাতাও বটে .....

তাহার সঙ্গে ফযল (বিশেষ কৃপা) আছে, যাহা তাহার আগমনের সহিত উপস্থিত হইবে। সে জাঁক-জমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হইবে। সে পৃথিবীতে আসিবে এবং তাহার সঞ্জীবনী শক্তি এবং পবিত্র আত্মার প্রসাদে বহুজনকে ব্যাধিমুক্ত করিবে। সে কালেমাতুল্লাহ-- আল্লাহর বাণী। কারণ খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাহাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হইবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাহাকে পরিপূর্ণ করা হইবে। সে তিনকে চার করিবে (ইহার অর্থ বুঝি নাই) সোমবার শুভ সোমবার। সম্মানিত মহৎ, প্রিয় পুত্র।

মাযহারুল হাক্কে ওয়াল উলা কায়ান্নাল্লাহা নাযালা মিনাস সামায়ে, অর্থাৎ– ''সত্যের বিকাশস্থল ও সুউচ্চ যেন আল্লাহ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 'তাহার আগমন অশেষ কল্যাণময় হইবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাব প্রকাশের কারণ হইবে। জ্যোতিঃ আসিতেছে; জ্যোতিঃ। খোদা তাহাকে তাহার সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করিয়াছেন। আমরা তাহার মধ্যে আপন রূহ ফুকিয়া দিব এবং

খোদার ছায়া তাহার শিরে থাকিবে। সে শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি লাভ করিবে এবং বন্দীদিগের মুক্তির উপায়স্বরূপ হইবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। জাতিগণ তাহার নিকট হইতে আশিষ লাভ করিবে। তখন তাহার আত্মিক কেন্দ্রের আকাশের দিকে উত্তোলিত হইবে। – ওয়া কানা আমরাম্মাকযিয়া (অর্থাৎ ইহাই আল্লাহ্‌র অটল মীমাংসা)। (ইশতেহার, ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ ইং)।

অতঃপর ১৮৮৬ সালের ২২শে মার্চ আর একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এ –ও ঘোষণা করেন যে, "উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অসাধারণ গুণসম্পন্ন মহান পুত্র মাত্র নয় বছরের মধ্যে অবশ্যই জন্ম লাভ করবে। সুতরাং এই নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যেই তৃতীয় বছর অর্থাৎ ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারি তারিখে 'শুভ সোমবার' নুসরত জাহা বেগম সাহেবার গর্ভে প্রতিশ্রুত পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন। তার পবিত্র নাম ১৮৮৮ সালের ১লা ডিসেম্বরের ইশতেহারে প্রকাশিত ইলহাম অনুযায়ী বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ রাখা হয়। তাঁর জন্মের পূর্বে এবং জন্মের পরও নির্দিষ্টভাবে তাঁর সম্বন্ধে ইহা প্রকাশ করেন য, মুসলেহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কার পুত্র) তিনিই। তিনি ১৯১৪ সনের ১৪ই মার্চ আহমদীয়াতের দ্বিতীয় খলীফা হন। তাঁর ৫২ বছর ব্যাপী সুদীর্ঘ খেলাফতকালীন বিপুল ঘটনাবলী প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় সাক্ষ্য প্রদান করেছে এবং তিনি নিজেও আল্লাহ তাআলার নিকট হতে ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে ১৯৪৪ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে মুসলেহ মাওউদ হবার দাবি করেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান ইসলাম প্রচার কেন্দ্রসমূহ ও বিপুল সংখ্যক উন্নতিশীল জামাত এবং তাঁর লিখিত কুরআন শরীফের তুলনাহীন অমূল্য তফসীর, (তফসীরে কবির ও তফসীরে সগীর) জ্ঞান ও তত্ত্বপূর্ণ দুইশতাধিক পুস্তক, খুৎবা ও বক্তৃতা এবং তাঁর দ্বারা জামাত ও নিযামে খিলাফতের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা জীবন্ত খোদার দর্শনকে চির অম্লান ও সমুজ্জ্বল রাখছে এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সত্যতার স্বাক্ষর হয়ে আছে ও থাকবে। শৈশবকাল থেকেই হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) অত্যন্ত ধী–শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। এই সেই পুত্র যার সম্বন্ধে তালমুদে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। -

It also said that he (7th Messiah) shall die and his kingdom descended to his son and grandson.

(তালমুদ; লেখক জোসেফ কারক্লে, ৫ম অধ্যায়,পৃষ্ঠা–৭, ১৮৭৮ ইং লন্ডন থেকে প্রকাশিত)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন এতে কোন সন্দেহ নাই যে, সবুজ ইশতেহারে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল সেখানে আমারই সম্পর্কে বলা হয়েছিল।" (আল ফযল, ২৩শে মার্চ ১৯৪০ ইং)।

৫-৬ জানুয়ারি ১৯৪৪ ইং তারিখের মধ্যবর্তী রাতে হযরত মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) আল্ল--াহর পক্ষ হতে ঐশী বাণী (ইলহাম) পেলেন– আনাল মসীহুল মাওউদ, মুছিলুহু ওয়া খালীফাতুহু।" অর্থাৎ আমি মসীহ মাওউদ (অর্থাৎ-তাঁর প্রতিচ্ছবি) এবং তাঁর খলীফা। অর্থাৎ তিনিই সেই প্রতিশ্রুত পুত্র মুসলেহ মাওউদ। এখানে আরবী ভাষার একটি চমৎকার শৈলী ব্যবহার করা হয়েছে। আমি মসীহ মাওউদ, প্রতিবিম্ব ও খলীফা। এর অর্থ দাঁড়ায়, আমি মসীহ মাওউদ (না, আমি প্রকৃত মসীহ মাওউদ নই) বরং তাঁর খলীফা। এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ২৮ জানুয়ারি ১৯৪৪ তারিখে মসজিদে আফসা কাদিয়ানে জুমুআর খুতবায় বিশদ ব্যাখ্যা দেন। (তারিখে আহমদীয়াত, ৯ম খন্ড, ৪৯১ পৃষ্ঠা)।

পরদিন কাদিয়ানে জলসা মুসলেহ মাওউদ অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে জামা'তের প্রথম সারির বুযুর্গগণ বক্তব্য পেশ করেন যে, সকল যুক্তি প্রমাণে প্রমাণিত এবং অবশেষে আল্লাহ তাআলা নিজ পবিত্র বাণী দ্বারা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) কে অবগত করেছেন যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মুসলেহ মাওউদ। (তারিখে আহমদীয়াত ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৯৬)। সবাইকে এ বিষয়ের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ হুশিয়ারপুর, ১২ই মার্চ লাহোর ২৩শে মার্চ লুধিয়ানা ও ১৬ই এপ্রিল ১৯৪৪ ইং তারিখে দিল্লীতে জলসা মুসলেহ মাওউদ অনুষ্ঠিত হয়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) লাহোরে অনুষ্ঠিত জলসায় আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলেন-

''আমি আজ এই জলসায় ওয়াহিদ ও কাহহার খোদার কসম খেয়ে বলছি, যাঁর নামে মিথ্যা কসম খাওয়া অভিশপ্তদের কাজ, যাঁর নামে মিথ্যা রচনাকারী তাঁর আযাব থেকে কখনো বাঁচতে পারে না; ঐ খোদার কসম খেয়ে বলছি, এই লাহোর শহরের ১৩নং টেম্পল রোডের শেখ বশির আহমদ সাহেব এডভোকেটের বাড়িতে আল্লাহ আমাকে খবর দিয়েছেন যে, মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত মুসলেহ মাওউদ আমি-ই। আমি সেই মুসলেহ মাওউদ যার হাতে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।" (আল ফযল, কাদিয়ান, ১৫ই মার্চ ১৯৪৪ ইং)।

এই মহান পুত্র সম্পর্কে স্বয়ং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন-

"১০ই জুলাই ১৮৮৮ ইং তারিখের বিজ্ঞাপনে এবং ১লা ডিসেম্বর ১৮৮৮ তারিখের বিজ্ঞাপনে যেমন উল্লেখ ছিল যে, আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন, প্রথম বশিরের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বশির দেয়া হবে, যার নাম মাহমুদ হবে। আজ ১২ই জানুয়ারি ১৮৮৯ ইং মোতাবেক ৯ই জমাদিউল উলা ১৩০৬ হিজরী রোজ শনিবার আলাহ্‌র ফযলে আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করেছে।" (ইশতেহার তাকমিলে তবলীগ, মলফুযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫১)।

১৮ই জানুয়ারি ১৮৮৯ তারিখে সাহেবযাদা মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেবের আকীকা করা হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এবং উম্মুল মু'মিনিন হযরত নুসরত জাহাঁ বেগম সাহেবা অত্যন্ত যত্ন সহকারে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) কে প্রতিপালন করতে থাকেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) বহুবার বলেছেন যে, এই ছেলেই প্রতিশ্রুত মুসলেহ মাওউদ হবেন। (আল হাকাম. জুবিলী, নভেম্বর, ডিসেম্বর ১৯৩৯ ইং, পৃষ্ঠা- ৮০, কলাম- ৩)।

মিয়া মাহমুদ সাহেব ১৮৫৫ সনে হযরত হাফেয আহমদ উল্লাহ নাগপুরীর কাছে কুরআন মজিদ নাযেরা পড়তে শুরু করেন এবং জুন ১৮৯৭ ইং সনে কুরআন নাযেরা শেষ করেন। ৭ই জুন ১৮৯৭ ইং তারিখে এ উপলক্ষ্যে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন যা 'আমীন অনুষ্ঠান' নামে এখনও জামাতে প্রচলিত। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন–

''সবুজ ইশতেহারে (১লা ডিসেম্বর ১৮৮৮ ইং) যে ছেলে মাহমুদের কথা বলা হয়েছিল, সে ছেলের জন্ম হয়ে গেছে। এখন সে ৯ বছরে পদার্পন করেছে। (শিরাজে মুনীর, পৃষ্ঠা- ৩১)। এই পুস্তকে তিনি (আ.) আরও লিখেন–

''হ্যাঁ সবুজ ইশতেহারে স্পষ্ট অক্ষরে অতি শীঘ্র পুত্র সন্তানের জন্মের প্রতিশ্রুতি ছিল। অতএব, মাহমুদের জন্ম হয়েছে। কত বড় মহিমান্বিত এই ভবিষ্যদ্বাণী। যদি অন্তরে খোদাভীতি থেকে থাকে তাহলে পবিত্র মন নিয়ে চিন্তা করে দেখ।" (পৃষ্ঠা ৩১)।

হযরত সাহেবযাদা মাহমুদ আহমদ সাহেব

(রা.) ১৮৯৮ সনে তালীমুল ইসলাম স্কুল কাদিয়ানে ভর্তি হন। পড়াশোনা শুরু করলেও বরাবরই তিনি উত্তীর্ণ হতে পারতেন না। তাঁর চোখের অসুস্থতা থাকতো। তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর ছেলে বিধায় তাঁকে পাশ করিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু তিনি মেট্রিক পাশ করতে পারেননি। তবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলতেন, তাঁকে আল্লাহ্ তাআলা পড়াবেন।' মির্যা সাহেব (রা.) হযরত মৌলভী নুরুদ্দিন (রা.) এবং কাছে কুরআন মজিদের অনুবাদ, তফসীর ও কিছুটা বুখারী শরীফও অধ্যয়ন করেন। জন্মগত আহমদী হওয়া সত্ত্বেও হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ১৮৯৮ ইং সনে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়াত করেন। হযরত মির্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেবই যে প্রতিশ্রুত মুসলেহ মাওউদ সে সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর কিতাব তিরইয়াকুল কুলুব পৃষ্ঠা- ১৪, ৩৪ ও ৪০–এ; তোহফায়ে গোলড়াবিয়া, পৃষ্ঠা- ৫৬–এ, হাকীকাতুল ওহী পৃষ্ঠা-২১৬ এবং নুযুলে মসীহ এর ১৯২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। আল-ওসীয়্যত পুস্তকে ১৯০৬ সনে তিনি (আ.) লিখেন– ''আল্লাহ্ তাআলা আমাকে খবর দিয়েছেন, আমি তোমার ঔরসজাত সন্তানদের মধ্য হতে একজনকে খাড়া করব- যাকে আমি আমার নৈকট্য ও ওহীর দ্বারা নিযুক্ত করব।'' (পৃষ্ঠা ৬, টীকা)।

অক্টোবর ১৯০২ ইং সনে সৈয়্যদা মাহমুদা বেগম সাহেবা (পিতা ডা. আব্দুর রশিদ উদ্দিন সাহেব) এর সাথে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) প্রথম পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর পবিত্র বেগম সাহেবাগণের নাম ও তাঁদের গর্ভজাত সন্তানদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল।

১। হযরত সৈয়দা মাহমুদা বেগম সাহেবা (উম্মে নাসের) বিনতে হযরত খলীফা রশিদুদ্দিন,

সন্তান- ১।সাহেবযাদা মির্যা নাসির আহমদ (শৈশব মৃত)
২। সাহেবযাদা মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)
৩। সাহেবযাদা মির্যা নাসেরা বেগম
৪। সাহেবযাদা মির্যা মুবারক আহমদ
৫। সাহেবযাদা মির্যা মুনাওয়ার আহমদ
৬। সাহেবযাদী আমাতুল আজিজ বেগম (শৈশবে মৃত)
৭। সাহেবযাদী আমাতুল আজিজ (২য়) বেগম
৮। সাহেবযাদা মির্যা হাফিয আহমদ (শৈশবে মৃত)
৯। সাহেবযাদা মির্যা হাফিজ আহমদ
১০। সাহেবযাদা মির্যা আনোয়ার আহমদ
১১। সাহেবযাদা মির্যা আজহার আহমদ
১২। সাহেবযাদা মির্যা রফিক আহমেদ

২। হযরত সৈয়দা আমাতুল হাই বেগম বিনতে হযরত মাওলানা হাকিম নুরুদ্দিন (রা.),

সন্তান- ১। সাহেবযাদী আমাতুল কাইয়্যুম বেগম
২। সাহেবযাদী রশিদ বেগম
৩। সাহেবযাদা মির্যা খলিল আহমদ।

৩। হযরত সৈয়দা মরিয়ম বেগম সাহেবা (উম্মে তাহের) বিনতে ডা. সৈয়দ আব্দুস সাত্তার শাহ,

সন্তান- ১। সাহেবযাদী আমাতুল হাকিম বেগম
২। সাহেবযাদী আমতুল বাসেত বেগম
৩। হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)
৪। সাহেবযাদী আমাতুজ জামিল।

৪। হযরত সৈয়দা সারা বেগম সাহেবা বিনতে হযরত প্রফেসর আব্দুর মাজেদ ভাগলপুরি,

সন্তান- ১। সাহেবযাদা মির্যা রফি আহমদ
২। সাহেবযাদী আমাতুন নাসির
৩। সাহেবযাদা মির্যা হাফিজ আহমদ।

৫। হযরত সৈয়দা আজিজা বেগম সাহেবা (উম্মে ওয়াসীম) বিনতে হযরত শেখ আবু বকর ইউসুফ,

সন্তান- ১। সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ
২। সাহেবযাদা মির্যা নাঈম আহমদ।

৬। হযরত সৈয়দা মরিয়ম সিদ্দিকা (উম্মে মতিন, ছোট আপা) বিনতে হযরত ডা. মীর মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব

সন্তান- ১। সাহেবযাদী আমাতুল মতিন।
১৯০৬ সনে তিনি (রা.) তালহিয়ুল আযহান নামে পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। যারাই মির্যা মাহমুদ আহমদ সাহেবের সম্পাদিত তাশহীয পড়েছেন তারা এই বয়সে এ ধরনের জোরালো প্রবন্ধ দেখে আশ্চর্য হতেন যে, কিভাবে এই বয়সে এই ধরনের প্রবন্ধ লিখতে পারেন। ১৮ই জুন ১৯১৩ হতে তিনি প্রতি তিন দিনে আল-ফযল প্রকাশিত করা শুরু করেন। পরে তা দৈনিক হিসাবে প্রকাশিত হয়। বর্তমানেও তা জামাতের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি প্রায় দুই শতাধিক পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি (রা.) হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি স্বীয় পিতা ও যুগের মসীহ হযরত আকদাস মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর মৃত্যুর পর (আ.) মাথার কাছে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন–

''যদি সকল মানুষ হযরত (আ.) কে পরিত্যাগ করে সরে চলে যায় এবং আমি সম্পূর্ণ একা হয়ে যাই তাহলে আমি একাই সকলের মুখোমুখি হব, প্রতিযোগিতা করব; কোন বিরোধিতা বা শত্রুতার পরোয়া করব না।''

(আল-ফযল, নভেম্বর ১৯৩৯; পৃষ্ঠা- ৭)।

মাত্র ১৪ বছর বয়সে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) নযম লেখা শুরু করেন। তিনি (রা.) লিখেন–

''খোদা হে আমার! স্বীয় করুণায় ক্ষমা করে
দাও মোরে
রোগ মুক্তি দাও প্রেমাক্রান্ত,
অসুস্থ তব তরে।''
(কালামে মাহমুদ)।

খিলাফতের প্রতি হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর আনুগত্যের সাক্ষ্য স্বয়ং হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–"মিয়া মাহমুদ যেভাবে আমার আনুগত্য করে তেমন আর কেউ করে না।' হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) অনেক জায়গায় বর্ণনা করেছেন। হযরত সৈয়্যদা নবাব মোবারেকা বেগম সাহেবা (রা.) লিখেছেন– ''সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা হচ্ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল। একদিন হযরত আম্মাজানের উঠানে হযরত আকদাস (আ.) পদচারণা করছিলেন।... হযরত (আ.) দাঁড়িয়ে গেলেন। হযরত আম্মাজান পেছনে পেছনে আসছিলেন; পেছনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। হযরত (আ.) সোজা দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং এভাবেই কথা বললেন। পেছনে খুব নিকটে আম্মাজান আছেন জেনেই তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'কখনও তো আমাদের মন বলে যে, মাহমুদের খিলাফত সম্পর্কে মানুষকে জানিয়ে দেই। তারপর আবার চিন্তা করি যে, স্বাভাবিকভাবে সময়মত আল্লাহর ইচ্ছা প্রকাশ পাবে।'' (তারিখে আহমদীয়াত, ৫, খন্ড, পৃ.– ৫১)।

তাঁর খিলাফতকালে জামাতের সার্বিক উন্নতির কথা খিলাফতের কল্যাণ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাই এখানে এর পুনরাবৃত্তি করলাম না। এই মহান পুরুষ সুদীর্ঘ ৫২ বছর খিলাফতের মহান দায়িত্ব পালন করে ৭–৮ নভেম্বর ১৯৬৫ ইং তারিখে আপন প্রভুর সকাশে গমন করেন।

অবিভক্ত ভারতের বিশিষ্ট মুসলমান নেতা মাওলানা জাফর আলী খান ১৩ই মার্চ ১৯৩৬ ইং তারিখে মসজিদ খায়রুদ্দীন অমৃতসরে আয়োজিত এক জলসায় বক্তৃতা করতে গিয়ে

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর কঠোর বিরোধী আহরারী নেতাদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

‘‘আহরারীরা মন দিয়ে শোন। তোমরা এবং তোমাদের সহযোগীরা কেয়ামত পর্যন্ত কোন দিন মির্যা মাহমুদের বিরুদ্ধে সফল হতে পারবে না। মির্যা মাহমুদের কাছে কুরআন আছে, কুরআনের জ্ঞান আছে ... মির্যা মাহমুদের সাথে এমন এক জামাত আছে, যে জামাত তাঁর ইশারায় তনু-মন-ধন সর্বস্ব তাঁর পদতলে বিসর্জন দিতে পারে।... মির্যা মাহমুদের হাতে মুবাল্লেগীন আছে, বিভিন্ন জ্ঞানে পারদর্শী আলেমরা আছে, পৃথিবীর সবদেশে তিনি তাঁর পতাকা গেড়ে রেখেছেন।’’ (এক খওফনাক সাজেশ, লেখক– মৌলভী মাযহার আলী, পৃষ্ঠা – ১৯৫; তারিখে আহমদীয়াত, ৭ম খন্ড, ৫৫৭ পৃষ্ঠা)। দামেস্কের পত্রিকা, ‘ফাতাল আরব’ ১৯২৪ ইং সনে হযরত (রা.) সম্পর্কে লিখেছে–

‘‘এই খলীফার বয়স চল্লিশ। মুখে কাল ঘন দাঁড়ি, চেহারায় গন্ধমী রং। চেহারায় প্রতাপ (জালাল) ও সম্মান (ওকার) বিদ্যমান। উভয় চোখে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, প্রখর মেধা এবং অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছে। তাঁকে যদি আপনি বরফের মত সাদা ধবধবে পাগড়ী পরা অবস্থায় দন্ডায়মান দেখেন আপনি দেখবেন যে, আপনি এমন এক ব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়েছেন যে, আপনি তাঁকে বুঝে উঠার অনেক আগেই তিনি আপনাকে বুঝে ফেলেছেন। তাঁর ঠোঁটে সব সময় হাসি খেলা করে। কখনো তা স্পষ্ট কখনো তা গোপন। আপনি যদি ঐ অবস্থাকে দেখেন, তাহলে আপনি তাঁর হাসির নিচে যে অর্থ এবং জালাল (প্রতাপ) রয়েছে তা দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। (মাসিক খাসেদ, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫ ঈং ও আল ফযল ১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০০৩ ইং)।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) নিজে বলেন–

‘‘আমি আল্লাহর ফযলের উপর ভরসা করে বলছি, পৃথিবীতে আমার নাম চিরদিন কায়েম থাকবে। যদিও আমি মারা যাব কিন্তু আমার নাম কখনো বিলুপ্ত হবে না। এটা খোদার সিদ্ধান্ত যা আকাশে গৃহীত হয়েছে যে, আমার নাম ও আমার কাজ পৃথিবীতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

যে আমার বিপরীতে দাঁড়াবে সে আলাহর ফযলে ব্যর্থ হবে। খোদা তাআলা আমাকে এমন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, বিরোধীরা যত গালি দিতে পারে দিবে; আমাকে যত খারাপই মনে করুক না কেন পৃথিবীর কোন বৃহৎ শক্তিরও ক্ষমতা নাই যে, সে আমার ক্ষতি করতে পারে। একশত বছর পরে তো আহমদীয়াত ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোন শক্তিই থাকবে না। সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের পরিপূর্ণ বিজয় প্রতিষ্ঠিত হবে। তখনও আহমদীয়া খিলাফত থাকবে; মজলিসে শূরা থাকবে; নেযামে ওসীয়্যত থাকবে। অতএব মুসলেহ মাওউদের নামও থাকবে।

‘‘এক ওয়াক্ত আয়েগা কে কাহেঙ্গে তামাম লোগ মিলাত কে

ইস ফিদায়ীপে রহমত খোদা কারে।’’

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ছাত্র ভর্তি

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ-এ ৭ বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সে ৮ম ব্যাচে ভর্তিচ্ছুদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। আগামী ৩০শে এপ্রিল ২০১৩ এর মধ্যে দরখাস্ত সেক্রেটারী বোর্ড অব গভর্ণরস, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ, ৪নং বকশি বাজার, ঢাকা বরাবর পৌছাতে হবে। আগামী ২১, ২২. ২৩ এবং ২৪শে মে ২০১৩ তারিখে ভর্তি-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। ***আবেদনকারীকে অবশ্যই ২০মে ২০১৩ তারিখ বিকাল ৫.০০টার পূর্বে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের অফিসে পৌঁছে রিপোর্ট করতে হবে।***

আবেদনকারীর যোগ্যতা ঃ (১) এস.এস.সি/এইচ.এস.সি-তে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং নূন্যতম “বি” গ্রেড থাকতে হবে। (২) এ বছর এইচ. এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে এস.এস.সি-তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে, (৩) ভাল স্বাস্থ্য ও মেডিকেল চেকআপে উত্তীর্ণ হতে হবে। (৪) সর্বোচ্চ বয়স সীমা, এস.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৭ এবং এইচ.এস. সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৯ বছর (৫) ওয়াকফে নও ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অগ্রাধিকার পাবে (৬) কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া অবশ্যই জানতে হবে, ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানে ভাল হতে হবে এবং জামাতি-বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে (৭) জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে (৯) আরবী, উর্দ্দূ ও ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে। (১০) বয়আত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বছর অতিক্রান্ত হতে হবে এবং এই তিন বছর জামা’তের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী হতে হবে। (১১) আবেদনকারীকে অবশ্যই খোদ্দামুল আহমদীয়ার স্থানীয় হতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের তালিম-তরবিয়তী ক্লাসে অংশগ্রহণকারী হতে হবে। (১২) ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও এপ্টিচিউড-এ ভাল ফলাফল করতে হবে (১৩) আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী অবশ্যই থাকতে হবে- অন্যথায় আবেদন পত্র গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। আবেদনকারীর সঠিক ঠিকানা এবং বাড়ির অথবা জামা’তের ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে। (ক) নিজের নাম (খ) পিতার নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) জন্ম তারিখ এবং বয়আতগ্রহণকারী হলে বয়আতের তারিখ (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটো কপি (চ) নিজ হস্তে আবেদন পত্র লিখতে হবে। (ছ) স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্টের সত্যায়ন থাকতে হবে (জ) জামা’তি মজলিসি চাঁদা পরিশোধ রয়েছে মর্মে স্থানীয় সেক্রেটারী মাল/নাযেম মালের সার্টিফিকেট থাকতে হবে (ঝ) ওয়াকফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে (ঞ) অন্য কোন বিশেষ-যোগ্যতা থাকলে তা উল্লেখ করতে পারেন (ট) জামা’তের এমন দু’জন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে, যিনি আপনার সম্বন্ধে ভাল করে জানেন (ঠ) জামা’তের কোন বুযুর্গ (মৃত বা জীবিত) এর সাথে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে, তবে তা উল্লেখ করুন।

বি. দ্র. প্রত্যেক স্থানীয়-জামা’তে জুমুআর নামাযে একাধিক দিন সার্কুলারটি এলান এবং নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের অনুরোধ করছি। প্রয়োজনে যোগাযোগ করার মোবাইল নম্বর ০১১৯১৩৬৩৪১৮, ০১৬৭৭৪৮৬৩৫৯ অথবা ০১৭৫৫৫৬৫৩০৯, ০১৯২২০২৪৫৯১।

সেক্রেটারী
বোর্ড অব গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

মাহমুদ আহমদ সুমন

(৮ম কিস্তি)

ইসলামের পূর্বে তৎকালীন সমাজে নারীর অধিকার বলেতে কোন কিছুই ছিল না। উত্তরাধিকার, দেনমোহরের অধিকার কিংবা বিবাহ তালাক, কোন কিছুতে মতামত প্রদানেরও যেমন তাদের কোন সুযোগ ছিল না, তদ্রূপ তাদের কোন অধিকারও স্বীকৃত হতো না। মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াত-পূর্ব জাহেলী সমাজে নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। এমনকি লোকজন তাদের কন্যা-সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতো। এ প্রসঙ্গে গত পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

মা হিসেবে নারীর মর্যাদা :

বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন নারীকে মা হিসেবে যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এছাড়া ইসলামে মা হিসেবে নারীকে যে উঁচু-মর্যাদা ও সম্মান দেয়া হয়েছে, অপর কোন সম্মানের সাথে তার তুলনাও হতে পারে না। নবী করীম (সা.) ঘোষণা করেছেন, "বেহেশ্‌ত মায়ের পায়ের তলে অবস্থিত।" অর্থাৎ মাকে যথাযোগ্য সম্মান দিলে, তার উপযুক্ত খিদমত করলে এবং তার হক আদায় করলে সন্তান বেহেশ্‌ত লাভ করতে পারে। অন্য কথায়, সন্তানদের বেহেশ্‌ত লাভ মায়ের খেদমতের উপর নির্ভরশীল। মায়ের খেদমত না করলে কিংবা মার প্রতি কোনরূপ খারাপ ব্যবহার করলে, মাকে কষ্ট ও দু:খ দিলে সন্তান যত ইবাদত বন্দেগী আর নেক কাজই করুক না কেন, তার পক্ষে বেহেশ্‌ত লাভ করা সম্ভবপর হবে না।

শ্রেষ্ঠ নবী খাতামান নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী নারীদেরকে মানুষ হিসেবে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে। আল্লাহ্ পাকের দৃষ্টিতে নারী পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কুরআনে বলা হচ্ছে, "পুরুষরা যা অর্জন করেছে, এতে তাদের অংশ রয়েছে। আর নারীরা যা অর্জন করেছে এতে তাদের অংশ রয়েছে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে পুরোপুরি অবগত" (সূরা আন্ নিসা: ৩৩)। কর্মের ফলাফলের দিক থেকেও নারী-পুরুষের সমতাকে পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত আয়াত প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখানে কাউকে কম বেশি বলে উল্লেখ করা হয়নি।

পবিত্র কুরআন আরো বলা হয়েছে "নিশ্চয় আমি তোমাদের কোন কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কর্মকে বিনষ্ট করবো না, তা সে পুরুষ হোক বা নারীই হোক। তোমরা একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত " (সূরা আলে ইমরান : ১৯৬)। "আর অবশ্যই আমরা আদম সন্তানকে সম্মানে ভূষিত করেছি।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৭১)। এ সম্মানে নারী-পুরুষ সমান অংশীদার। নারী-পুরুষে বা মানুষে-মানুষে সম্মানের পার্থক্যের কল্যাণ একমাত্র তাক্‌ওয়া বা আল্লাহ্‌কে মেনে চলা। যদি নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিক মুত্তাকী হয়, তবে সে আল্লাহ্‌র নিকট অধিক সম্মানিত। পুরুষ বলেই কেউ নারী থেকে অধিক সম্মানিত হয় না। সকল আদম সন্তানকে আল্লাহ্ তাআলা সমভাবে সম্মানিত করেছেন এবং কোন বিশেষ জাতি বা গোত্রের প্রতি পক্ষপাতমূলক ব্যবহার করেননি। উপরোক্ত আয়াত ধর্ম, বর্ণ, বংশ সব ভেদাভেদ শেষ করে দিয়েছে।

ইসলাম নারী জাতির জন্য শিক্ষার দ্বারকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আর এজন্যই তো মহানবী (সা.) বলেছেন, জ্ঞান আহরণ করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর অবশ্য কর্তব্য। নবীজীর এই হাদীসের প্রতি সাড়া দিয়ে জ্ঞানাহরণ ও বিদ্যার্জনে আত্মোৎসর্গ করার ন্যায্য স্বাধীনতা রয়েছে প্রত্যেক নারীর। পর্দার মধ্য থেকে ইচ্ছা করলে যে কোন নারী উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে, আর এতে কোন বাধা নেই।

ইসলামী শরীয়ত নারী-পুরুষ উভয়কেই সমান সামাজিক-মর্যাদা এবং অধিকার দিয়েছে। কোন নারী যদি আশ্রয়হীন বা অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে, তাহলে সে তার জীবন-জীবিকার প্রয়োজন পূরণ এবং স্বীয় সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে হালাল উপায়ে কামাই-রোজগার করতে পারে। এ জন্য সব রকম বিধিসম্মত উপায়ও সে অবলম্বন করতে পারে। নারী পর্দা করে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং সম্পদ-সম্পত্তি থাকলে সেসবের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও তদারকির জন্যও বাইরে যেতে পারে।

ইসলাম নারীকে তার পিতা-মাতা, স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়ের নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভের অধিকারও দিয়েছে। নারী তার স্বামীর নিকট হতে নির্ধারিত ও সম্মানসূচক অতিরিক্ত আর্থিক নিশ্চয়তাস্বরূপ মোহরানার অধিকারী। নারী বিয়ের পূর্বে অভিভাবক ও বিয়ের পরে স্বামীর নিকট হতে নিশ্চিতভাবে ভরণপোষণের অধিকারী। ব্যবসায়ে নিয়োজিত অর্থ, নিজ পরিশ্রমের অর্থ ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সকল সম্পদে নারী আইনগত মালিকানা স্বীকৃত। তালাকের ব্যাপারে স্বামীর যতটুকু অধিকার রয়েছে, স্ত্রীরও ঠিক ততটুকু অধিকার রয়েছে। স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে সব সময়ই বৈবাহিক-অধিকার দাবী করতে পারে। যদি স্বামীর একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকে, তবে সব স্ত্রী সমানাধিকার দাবী করতে পারে। বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা হলে নারী পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আইনগত মর্যাদা রাখে।

ইসলাম পুরুষের ন্যায় নারীকেও সমানভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতি-উৎকর্ষ সাধনের অধিকার দিয়েছে। ইসলামের বিধি-বিধান পালন করা যেমন পুরুষের কর্তব্য, তেমনি নারীও যদি এ বিধি-বিধান মেনে চলে, তবে ফল লাভের অধিকার সমান। আধ্যাত্মিক মর্যাদার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা

হয়নি। মহানবী (সা.) বলেছেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা কি জাননা, নারীরা পুরুষের চেয়ে অধিকতর পুরস্কৃত হওয়ার অধিকারী, কারণ নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সে পুরুষদের জন্য বেহেশ্‌ত নসীব করবেন, যাদের স্ত্রীরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ও তাদের জন্য দোয়া করে। (সিয়াসিত্তা)

উপরোক্ত আলোচনায় বলা যায় যে, নারী জীবনের আবাহন, পুলকের সংগীত, পবিত্র স্নেহ-মমতার প্রতীক, বিশ্ব নিখিলের প্রাণ-স্পন্দন। বিশ্বের যত বড় বড় ব্যক্তি, তারা সবাই নারীর গর্ভে অস্তিত্ব লাভ করেছে, নারী কর্তৃক প্রসবিত এবং নারীর ক্রোড়েই লালিত পালিত হয়েছে। মানবজাতির মর্যাদা বাড়িয়েছে নারী, গোটা মানবতাই নারীর কাছে ঋণী। এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না, পারে নি আর পারবেও না কোন দিন। জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান বস্তু নারীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। পবিত্রতা, প্রেম-ভালবাসা, প্রভৃতি শব্দ তারই জন্য হয়েছে রচিত। নারীদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা মুসলমানদের অন্যতম জাতীয় দায়িত্ব।

নারীর অধিকার প্রদানে বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতা এবং ধর্মের চেয়ে ইসলাম যে কত অগ্রগামী ছিল তা বলা বাহুল্য। মহানবী (সা.) সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অথচ অন্যান্য ধর্মে নারীদের ছিল না কোন মর্যাদা। যেমন বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে নিচ এবং পাপে পূর্ণ হিসেবেই দেখানো হয়েছে। বলা হয়েছে নারীর মতো ভয়াবহ আর কিছুই নেই। মোটকথা, বৌদ্ধ ধর্মে নারীর অবস্থান আরো নিচু। এ ধর্মে নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করা হয়।

আর হিন্দু ধর্মে নারীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বেদ বা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পড়া অথবা কোন ধর্মীয় কর্মকান্ডে নারীর কোন ভূমিকা ছিল না। বিধবা হবার পর পূনর্বিবাহ বা সম্পত্তির অধিকার তো দূরের কথা, স্বামীর সাথে এক চিতায় সহমরণই ছিল তার একমাত্র পরিণতি। হিন্দু ধর্ম ও সমাজে কোন কালেই নারী তার যথার্থ মর্যাদা ও অধিকার পায়নি। হিন্দু পুরাণে উল্লেখ আছে, "মৃত্যু, নরক, বিষ, সর্প, অগ্নি এর কোনটিই নারী অপেক্ষা অধিক খারাপ ও মারাত্মক নয়।' হিন্দু সমাজে যুবতী নারীকে দেবতার সন্তুষ্টির জন্য কিংবা বৃষ্টি, ধনসম্পত্তি লাভের জন্য বলিদান করা হত। বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ কিংবা সহমরণের ন্যায় জঘন্য রীতি প্রচলিত ছিল। এখনো হিন্দু সমাজে নারীরা পৈত্রিক-সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত। অপর দিকে গ্রিক সভ্যতায় নারী ছিল পিতা, ভাই বা অন্য পুরুষ আত্মীয়ের অধীন, কেননা তাদেরকে Minor মনে করা হত। বিয়ের সময় তাদের মতামতের কোন প্রয়োজন হত না এবং পিতার কাছ থেকে সে যেত তার স্বামী নামক প্রভুর ঘরে। আর রোমান সভ্যতায় নারীর যে পৃথকভাবে কিছু করা সক্ষম, তাই বিশ্বাস করা হতো না। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার ভাষ্য মতে, রোমান সভ্যতায় কোন মহিলা বিয়ে করলে স্বাভাবিকভাবেই তার সম্পদের মালিক হত তার স্বামী। সেই সম্পত্তি আর সে ফেরত নিতে বা স্বামীর অনুমতি ছাড়া খরচ করতে পারত না। মহিলারা কোন উইল বা চুক্তি করতে পারত না; এমনকি নিজের সম্পদের ব্যাপারেও না।

হিব্রু ও প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্য সভ্যতায় নারীর মর্যাদা ছিল এমন যে, প্রাচীন-আরবে হিব্রু ও আরবি রীতি চালু ছিল। প্রাচীনকালে আরবরা যখন শুনতো তার কন্যা সন্তান হয়েছে তখন রাগে তাদের মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করতো। এটা ছিল এমন একটা যুগ যখন কন্যা-শিশুদের জীবন্ত মাটি-চাপা দিয়ে হত্যা করা হতো। ধারণা করা হতো যে কন্যাশিশু পিতার অসম্মানের কারণ হবে। পক্ষান্তরে পুত্রের জন্ম-সংবাদে তারা আনন্দে মাতোয়ারা হতো। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সন্তানরা পিতার বিধবা স্ত্রীদেরও মালিক হতো।

ইহুদী ধর্মে নারী সকল পাপকর্মের হোতা হিসেবে উপেক্ষার পাত্রী বলে গণ্য। ইহুদী ধর্মের বাণী, "মেয়েদের গুণের চাইতে পুরুষের দোষও ভাল।" হিন্দু ধর্মের ন্যায় এ ধর্মেও সম্পত্তিতে নারীর কোন অধিকার নেই।

বাইবেলের বর্ণনা মতে, হযরত আদম (আ.)-এর পাঁজরের হাড় থেকে বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে। বাইবেল আদি পাপের জন্য বিবি হাওয়াকে দায়ী করে। বাইবেল বলে, মহিলাদের মাসিকের সময় তাদের সাতদিন পৃথক রাখতে হবে। এ সাতদিন পর মহিলাকে ধর্মযাজকের কাছে উপস্থিত হয়ে দু'বার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে-একটি অপবিত্রতার জন্য, অপরটি পাপের জন্য, কারণ ঋতুস্রাব একটি পাপ।

নারীর প্রতি যীশু কোনো নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন না। শোনা যায়, তিনি আদি-পাপের ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। মেয়েরা এ পাপ বয়ে চলেছে বলে তিনি মনে করতেন না। কিন্তু সেন্টপল যীশুর দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেন। সেন্টপল বলেন, নারী নীরবতার মধ্যেই জীবন যাপন করবে, তাকে শিক্ষিত করার বা পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ দেয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি নারী প্রসঙ্গে ওল্ড টেষ্টামেন্টের দৃষ্টিভঙ্গীই পুনর্ব্যক্ত করেন যে, আদম (আ.)কে প্রথম সৃষ্টি করা হয় এবং তাঁর পাঁজরের হাড় থেকেই বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়। বিবি হাওয়া পাপের প্ররোচনায় হযরত আদম (আ.)-কে আদি পাপ করতে উৎসাহিত করেন। এই আদি-পাপের গ্লানি সকল নারীকে বহন করতে হবে। তিনি আরও বলতেন, ঈশ্বর নিজের মত করে পুরুষকে বানিয়েছেন আর পুরুষ থেকে নারী। ফলে নারী অবশ্যই পুরুষের চেয়ে নিম্নমানের। নারীর প্রতি ঘৃণাবশত: সেন্টপল চিরকুমার থেকে যান এবং অনুসারীদেরও চিরকুমার থাকতে আদেশ করেন। যদিও যীশুর শিষ্যরা নারীর প্রতি চরম নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন কিন্তু তারা মেরী (আ.)-কে বিশেষ সম্মান করতেন কারণ তিনি 'ঈশ্বরের জন্মদাত্রী'। এ ধরণের দ্বিমুখী আচরণ কিন্তু বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতায়ও দেখা যায় যেখানে 'নারীকে দেব-দেবীর জন্মদাত্রী ভাবা হতো। নারী মূর্তির পূজা হতো অথচ সে সমাজে নারীর কোন মর্যাদা বা অধিকার ছিল না।

প্রাচীনকালের খ্রিষ্টান যাজকদের উপর সেন্টপলের চিন্তাধারার প্রভাব সর্বক্ষেত্রে ছিল। নারীর প্রতি সেন্টপল-এর নেতিবাচক ধারণার প্রভাব প্রথম যুগের যাজকদের বিভিন্ন লেখায় দেখা যায় যেমন : Lecki-তে আছে 'নারী হচ্ছে সমস্ত দোযখের দরজা, সকল রোগের জননী। আরও বলা হয় নারী হয়ে জন্ম নেওয়ার জন্য তাকে সার্বক্ষণিক অনুশোচনায় থাকা উচিত। সেন্ট গ্যাষ্টিনসহ প্রথম প্রায় সকল যুগের ফাদার বিবি হাওয়ার আদি পাপে বিশ্বাস করতেন এবং সব নারীই যে পাপ বয়ে চলছে তা মানতো।

মোটকথা, খ্রিষ্টধর্মে নারী নরকের দ্বার ও মানবের সকল দু:খ-দুর্দশার হেতু বলে পরিগণিত। নারী সকল অন্যায়ের মূল, তারা পুরুষের মনে লোভ-লালসা উদ্রেককারী। তাদের কারণে ঘর, সমাজে অশান্তি বিরাজ করে। আবার আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে নারী তার অর্থনৈতিক অধিকার ফিরে পেলেও প্রতিনিয়ত তারা অবাধ যৌনাচারের যুপকাষ্ঠে বলির শিকার হচ্ছে। এভাবে পৃথিবীতে প্রচলিত সকল ধর্ম ও সমাজে নারীর অবস্থান পর্যালোচনা করলে স্বচ্ছ-ফটিকের ন্যায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, একমাত্র ইসলামই নারীকে তার স্বমর্যাদা ও স্বমহিমায় সমাসীন করেছে। ইসলাম নারীর নগ্নতাকে কিংবা ভোগ-বিলাসের উপাদান হিসেবে ব্যবহারের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশ্রয় দেয় না। ইসলাম নারীকে পুরুষের ন্যায় সম-মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে সমাজে যেমন শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে তেমনই সংসারে এনে দিয়েছে সুখ-শান্তি।

(চলবে)

masumon83@yahoo.com

প্রথম বাঙালি শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(৭ম কিস্তি)

মোহাম্মদ ওসমান গনি

বাল্যকাল থেকে পবিত্র জীবন যাপনের মাধ্যমে যৌবনে ইমামুজ্জামানের দীক্ষা গ্রহণে তিনি নিজেকে ধর্মের সেবায় উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার পালনে আজীবন কাজ করেন। বয়আতনামা ও খোদ্দামের আহাদনামা পাঠে জান, মাল, সময় ও ইজ্জত কুরবানীর তাঁর যে প্রতিশ্রুতি ছিল তা পূর্ণাঙ্গভাবে পালনে তিনি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করেন। পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্ তাআলার শিক্ষা–মু'মিনদের মাঝে এমন অনেক পুরুষ রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছিল। আর তাদের মাঝে এমনও (লোক) আছে যারা নিজেদের সংকল্প পূর্ণ করেছে (অর্থাৎ শাহাদত বরণ করেছে)। আর তাদের মাঝে এমনও (লোক) আছে যারা এখনো অপেক্ষা করছে এবং তারা কখনো (নিজেদের সংকল্পের) কোন পরিবর্তন করেনি (সূরা আল আহযাব ৩৩ : ২৪)। ওসমান গনি পবিত্র কুরআনের এ শিক্ষা পালনে নিজেকে কুরবানী করে দেন।

অপর বীর বাঙালি আব্দুর রহিম মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি হাসপাতালে ৫ নভেম্বর ১৯৬৩ তারিখ ভোররাতে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তিনিও খোদা প্রদত্ত শাহাদতের পুরস্কার লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। আকাশে তাঁর নাম শহীদের জন্য নির্ধারিত ছিল। তাই তিনিও শাহাদতের মুকুট লাভের সৌভাগ্যবান হন। তখন হাসপাতালে তাঁর সন্তানসহ অনেক আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত ছিলেন। সকলই কান্নায় ভেঙ্গে পরেন। এক হৃদয় বিধারক শোকের মাতম সৃষ্টি হয়। যেন আকাশে কান্নার রুল পরে।

৫ নভেম্বর শহীদ আব্দুর রহিমের পবিত্র মরদেহ আহমদী পাড়াস্থ মসজিদ মোবারক এর প্রাঙ্গনে নিয়ে আসা হয়। তখন আমি আট/নয় বছরের বালক। দৌড়ে চলে যায় শহীদের পবিত্র মরদেহ দেখতে। শ্যামবর্ণের হালকা পাতলা গড়ন হাস্যোজ্জ্বল নূরানী চেহারার শহীদের দিদার লাভকারীকে সেদিন আমার দেখার সৌভাগ্য হয়। তিনি ঘুমিয়ে আছেন শান্ত হয়ে। আজ দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরও আমার স্মৃতিপটে সেই দৃশ্যপট অম্লান হয়ে আছে। তাঁকে শহীদ ওসমান গনির পার্শ্বে চির নিদ্রায় শায়িত করা হয়। আত্মীয় স্বজন ও জামাতের সতীর্থরা গভীর শোকে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁকে বিধায় জানান। তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনায় খাস দোয়া করেন।

বৃহৎ আকারের গোরস্থানের প্রথমদিকে রাস্তার পার্শ্বে পবিত্র শহীদের কবর দেওয়া হয় এবং যুগল শহীদের কবর দুইটি সংরক্ষণের জন্য জামাত কর্তৃক পাকা করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত জামাতে আহমদীয়ার দেশী বিদেশী অনেক বুযুর্গ এ কবর জিয়ারতে আসেন। কিন্তু হায়! হযরত রসূল করীম (সা.) এর হাদীস অনুযায়ী আকাশের নীচের নিকৃষ্ট জীবে পরিণত নিম্নমানের মোখালেফাতকারীরা আশির দশকে কবরগুলি ভেঙ্গে ফেলে। মাটি খুড়ে মাটির নীচের ইটগুলি পর্যন্ত তোলে ফেলা হয়। ফলে বর্তমানে কবর দু'টির কোন অস্তিত্ব নেই। শহীদের কবরের পার্শ্বে স্থানীয় জামাতের সদস্য সাদির খান ও আব্দুস সামাদ মিঞার কবর পাকা করা হয়েছিল। মোখালেফাতকারীরা সেই কবরগুলিও ভেঙ্গে ফেলে। বর্তমানে উক্ত স্থানে পাকা কবরের কোন চিহ্ন খোজে পাওয়া যায় না। এমন কি এই কবরস্থানে আহমদী ব্যক্তিদের আরও যে ক'টি পাকা কবর ছিল সেগুলিও ভেঙ্গে ফেলা হয়। সেই সময় ১৯৮৭ সালে আহমদী পাড়াস্থ জামাতের মসজিদ-মসজিদ মোবারক তারা অবৈধভাবে দখল করে নেয়। যা আজও জবর দখল অবস্থায় আছে।

বলাবাহুল্য, জলসায় আক্রমণের সময় বিরুদ্ধবাদীরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাতের প্রবীন সদস্য শহরের প্রভাবশালী ব্যক্তি শিমরাইলকান্দির আব্দুস সামাদ মিঞা ও তাঁর বড় ছেলে জহর মিঞাকে জলসাগার থেকে ধরে বলপূর্বক নিয়ে যান এবং চার কিলোমিটার দূরে বিরাশার গ্রামে আটক করে রাখেন। আহমদী ছাড়ার ও হত্যার হুমকি দেয়। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার মহিমায় পর দিন তাঁরা মুক্তি পান।

কবর ভেঙ্গে ফেলার এ দৃশ্যপট স্বচক্ষে দেখলে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। আমরা সভ্য বলে দাবীদার যুগে অসভ্য বর্বর মানুষের মত ইট সিমেন্টের গড়া জড় পদার্থের কবর পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলা অনেক বড় জঘন্য কাজ। তবে অদূর ভবিষ্যতে আহমদীয়াতের বিজয়ের প্রবাহমান ধারায় এ বীর শহীদদের কবর জিয়ারতে হাজার হাজার পুণ্যার্থী ছুটে আসবেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শিমরাইলকান্দী গ্রামে অবস্থিত পৌর কবরস্থান সরগরম হয়ে উঠবে। আশেকে মসীহদের পদচারণায় তিতাস নদীর পাড় মুখরিত হবে। আর তাঁরা আফসোস করবেন এবং ধিক্কার দিবেন সেই জঘন্য বিরুদ্ধবাদীদের যারা বীর শহীদের কবর পর্যন্ত ভেঙ্গে অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়েছে।

তবে বাহ্যিকভাবে ইট সিমেন্টের সংরক্ষিত কবরের কোন চিহ্ন বর্তমানে না থাকলেও শহীদের আত্মাদানে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভকারীরা চিরকাল জীবিত। স্বর্গ সুখের

আনন্দ উল্লাসের মাঝে বাস করেন অনন্তকাল।

তাদের আত্মত্যাগের অবদান কোনদিন ম্লান হবে না। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাদের সম্বন্ধে বলিও না তারা মৃত। বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারছ না (সূরা আল বাকারা ২ : ১৫৫)। যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তুমি কখনও মৃত মনে করিও না। বরং তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সান্নিধ্যানে জীবিত এবং তাদেরকে রিযক দেয়া হচ্ছে (সূরা আলে ইমরান ৩ : ১৭০) যদি তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হও অথবা মৃত্যুবরণ কর তা হলে নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ক্ষমা এবং রহমত, উহা হতে অনেক উত্তম যা তারা সঞ্চয় করেছে (সূরা আলে ইমরান ৩ : ১৫৮)।

দুই বাংলার প্রথম জামাত যেমন প্রথম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি আল্লাহ্‌ তাআলার মহিমায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাটিতে প্রথম আহমদীয়াতের বিজয় গাথার শহীদের জয় নিশান উড়ে। সাহেবযাদা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) তৎকালীন সদর, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাত সফরকালে জামাতের কুরবানীর আবশ্যকতার যে আশা ব্যক্ত করেছিলেন ওসমান গনি ও আব্দুর রহিম একমাসের মধ্যে শহীদের আত্মত্যাগে তা পূর্ণ করেছেন। ফলে বাংলার আকাশে উদিত হয় যুগল শহীদের রক্তিম সূর্য।

গনি সাহেব আল্লাহ্‌র সাথে উত্তম বাণিজ্যে যা অর্জন করেছিলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁকে শাহাদতের পুরস্কারের মাল্যে ভূষিত করেন। তাঁর ইহ জীবন স্বার্থক ও সফল হয়। কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন–যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও এক মহাপুরস্কার (সূরা আল্‌ মায়েদা ৫ : ১০)। জান্নাতের (প্রতিশ্রুতির) বিনিময়ে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের ধন সম্পদ কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে এবং তারা (শত্রুকে) হত্যা করে নয়ত তারা (শত্রুর হাতে) নিহত হয়। এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা তারই দায়িত্ব যা তওরাত, ইন্‌জিল এবং কুরআনে বর্ণিত আছে। আর নিজ প্রতিশ্রুতি পালনে আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত আর কে আছে? অতএব তোমরা তার সাথে যে ব্যবসা করছ তাতে তোমরা আনন্দিত হও। আর এ-ই হলো মহাসফলতা (সূরা আত্‌তওবা ৯ :১১১)। গনি সাহেব সেই লাভজনক ব্যবসা করে আনন্দিত হন এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে মহাপুরস্কার শাহাদত দান করেন।

গনি সাহেবের শাহাদতের বিজয় মালা লাভের ফলশ্রুতিতে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জলসার পর মঙ্গলবার আর বাড়ি ফিরে যাওয়া হয়নি। মাতা-পিতা ও ভাইবোনদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। এমন কি তাঁর শহীদের রক্ত মাখা পবিত্র দেহ কোন আত্মীয় স্বজনের দেখার সৌভাগ্য হয়নি। ৪ নভেম্বর সোমবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে একটি এবং ঢাকা থেকে অপর একটি টেলিগ্রামের মাধ্যমে মৃত্যুর সংবাদটি মানিকগঞ্জ তাঁর নিজ বাড়িতে পৌঁছে। সংবাদ শুনে বাড়িতে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। কাঁদতে কাঁদতে অনেকে মুর্চা যান। মাতা নাড়ী ছেড়াধন হারিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যান। পিতা ওমরউদ্দিন সরকার তাঁর শালক নূরুল হক খানকে নিয়ে ঢাকার বকশী বাজার দারুত তবলীগে ৪ তারিখ বিকালে ছুটে আসেন। কিন্তু সে সময় যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে ব্রাহ্মণবাড়িয়া গিয়ে তাঁর মরদেহ দেখা সম্ভব হয়নি। তবে ৪ তারিখ রাত ১২টা পর্যন্ত তাঁর আত্মীয় স্বজনের জন্য অপেক্ষা করে তাঁকে চির নিদ্রায় সায়িত করা হয়।

সরকার সাহেব ছেলে হারানোর শোকে একদিকে যেমন শোকাভিভূত হন, অপর দিকে ছেলের ধর্ম সেবার আত্মত্যাগের গৌরবগাথা কাহিনী শুনে গৌরবান্বিত হন। তাঁর উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নিরপরাধ ছেলেটি উগ্রবাদী মোল্লাদের নেতৃত্বে নির্মম ভাবে শহীদ হওয়ার কারণে তিনি আহমদীয়া জামাতের সত্যতার প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে ৬ নভেম্বর ১৯৬৩ তারিখ বকশী বাজার দারুত তবলীগে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। পরবর্তীতে তাঁর সন্তানদের মধ্যে খায়রুন্নেসা বেগম, তালুকজান বেগম ও সুফিয়া বেগম বয়আত করে আহমদী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

এ জলসায় ওসমান গনি ও আব্দুর রহিম শহীদ হওয়ার সাথে যারা আহত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ক'জন হলেন (১) জনাব মীর মোহাম্মদ আলী প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ (২) জনাব মীর আব্দুস সত্তার মৌড়াইল, (৩) জনাব সালেহ আহমদ ভূঞা ক্রোড়া, (৪) জনাব আনিসুর রহমান ভূঞা ক্রোড়া, (৫) জনাব আউসাফ আলী তারুয়া, (৬) মোহাম্মদ শাহজাহান মিঞা রংপুর প্রমুখ।

তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঈমানবর্ধক ঘটনা

গনি সাহেবের জীবনের প্রতিটি অধ্যায় ছিল রূহানিয়তের বাগানে পরিস্ফুটিত এক একটি সুরভিত গোলাপ। আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের শিক্ষা পালনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইমামুজ্জামান হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) এর জামাতের আদর্শবান তবলীগ সৈনিকের দৃষ্টান্ত। খোদার রাহে জীবন কুরবানীর এক মহান ব্যক্তির উপাখ্যান। যা তাঁর জীবনে আলোকোজ্জ্বল জ্যোতিতে ঝলমল অম্লান হয়ে রয়েছে। আলোকিত সোনাঝড়া দিনের কিছু সংখ্যক ঘটনা নিম্নে আলোকপাত করা হল :–

১। সুন্দরবন জামাতের ধর্মের এক উত্তম সেবক ছিলেন সামসুর রহমান সাহেব টি কে। তিনি ১৯৬১ সালে রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় যোগদান করে আল্লাহ্‌ তাআলার নতুন আকাশ ও নতুন জমিন সৃষ্টির রহস্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সানী (রা.) হাতে বয়আত করেন। অত:পর নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে এসে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর জাহির হওয়ার সংবাদ অকপটে প্রচার করতে থাকেন। ফলে তাঁর তবলীগে এবং সততা, সুনাম ও ব্যক্তিত্বের পরশে যতীন্দ্রনগর গ্রামের কিছু সংখ্যক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আহমদীয়া জামাতের প্রতি আকৃষ্ট হন।

তাই সামসুর রহমান সাহেব ১৪-১৫ এপ্রিল ১৯৬২ তারিখ পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ৪৩তম সালানা জলসায় এ জেরে তবলীগ বন্ধুদেরকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। তাঁরা ঐশী জামাতের মিলন মেলার জলসায় রূহানিয়তের সৌরভ উপলব্ধি করে বয়আত করেন। অত:পর নিজ বাড়ি যতীন্দ্রনগর গিয়ে আহমদীয়াতের সত্যতার প্রচার করতে থাকেন। ফলে আহমদীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে একদল বিরুদ্ধবাদী মৌলবি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠে। প্রচন্ড মোখালেফাত সৃষ্টি হয়। কিছু সংখ্যক মৌলবি আহমদীদের সাথে বহাস করতে সম্মত হন। ফলে জামাতের নবদীক্ষিত সদস্য সুন্দরবন স্কুলের শিক্ষক জনাব আলী মাষ্টার ঢাকায় দারুত তবলীগে ছুটে আসেন। তৎকালীন প্রাদেশিক আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেবের নিকট আরজ করেন– আমীর সাহেব আমরা মোখালেফাতের সম্মুখীন হয়েছি।

(চলবে)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর ৮৯তম সালানা জলসা দোয়া ও কুরবানীর ফলশ্রুতিতে সফলতার সাথে সমাপ্ত

মহান খোদা তাআলার অশেষ কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ৮৯তম সালানা জলসা গত ৮, ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ ঢাকার অদূরে (৪২কি:মি: উত্তরে) গাজীপুরের কালিয়াকৈরের মৌচাকে ৩দিন ব্যপি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু জলসার দু'দিন পূর্বেই কিছু সংখ্যাক উগ্র-ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা জলসাগাহের জন্য নির্মিত সব পেন্ডেলে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং মালামাল সব লুট করে নিয়ে যায়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পূর্ব অনুমতি নেয়া সত্বেও এ ধরণের কর্মকান্ড ঘটানো হয়েছে মৌলবাদীদের মাধ্যমে। তারপরও আহমদীয়া মুসলিম জামাত যেহেতু আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং কোন ক্ষেত্রেই আইন অমান্যকারী নয় তাই আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের নিজস্ব স্থানে জলসার কার্যক্রম যথা সময়ে শুরু করে খোলা মাঠে। শত শত মাইল দূর থেকে শত বাধা পেড়িয়ে জলসায় শরীক হওয়ার জন্য ছুটে আসেন হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ। এ জলসা যেহেতু বাংলাদেশ জামাতের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শত বর্ষ জলসা তাই প্রায় ৫০টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ এই মহতী জলসায় অংশগ্রহণ করেন।

জলসার প্রথম দিনের কার্যক্রম শুরু হয় দারুত তবলীগ প্রাঙ্গনে খোলা মাঠে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মাওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব বশীর উদ্দীন আহমদ। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মাওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব। উর্দূ নযম পাঠ করেন জনাব সুলতান মাহমুদ আনোয়ার ও তার দল। বক্তৃতা পর্বে 'বাংলাদেশে আহমদীয়াতের শতবর্ষ পালনের প্রেক্ষাপট' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতার একাংশে বলেন, আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করেছে কিন্তু আমাদের প্রিয় খলীফার সরাসরি দিকনির্দেশনায় প্রতিদিন সাতটি করে খাসি সদকার মাধ্যমে আমরা বড় ধরণের ক্ষতি থেকে রক্ষা পেয়েছি। তিনি আরো বলেন, আমরা ইনশাআল্লাহ সুষ্ঠুভাবে আমাদের জলসা সম্পন্ন করতে পারব। জলসার এই পর্যায়ে বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান।

এরপর 'বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মোহতরম মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর। এরপর বক্তব্য রাখেন মোহতরম মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব, মুফতি সিলসিলাহ।

জলসার দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন মোহতরম আব্দুল ওয়াগিস হাউজার, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, জার্মানীর সভাপতিত্বে সকাল ৯-৩০ মি. শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন, জনাব সালাহ উদ্দিন আহমদ। আরবী কাসিদা পাঠ করেন জনাব মামুনুর রশিদ ও তার দল।

বক্তৃতা পর্বে 'খিলাফত মুসলিম ঐক্যের একমাত্র পথ' বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন মোহতর খলিলুর রহমান। এরপর বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব এস, এম, রহমতুল্লাহ্ ও তার দল।

এরপর 'হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর রসূল প্রেম' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। এ পর্যায়ে উর্দূ নযম পাঠ করেন জনাব ইসমত উল্লাহ।

এরপর বক্তব্য রাখেন পাকিস্তান থেকে আগত মোহতরম মওলানা সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেব। এরপর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিবর্গ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

জলসার দ্বিতীয় দিনের তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ২:৪৫মি, থেকে। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম এ্যাডভোকেট মুজীবুর রহমান সাহেব। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মসিউর রহমান। নযম পাঠ করেন জনাব এহসানুল হাবীব ও তার দল।

বক্তৃতা পর্বে 'বাংলাদেশে আহমদীয়াতের শতবর্ষ : বিরোধিতা ও সহমর্মিতা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম আহমদ তবশির চৌধুরী, ইনচার্জ এমটিএ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। এরপর 'পশ্চিম বাংলা ও আসামে আহমদীয়াত' এই প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মোহতরম মাশরেক আলী মোল্লা। এ পর্যায়ে নযম পরিবেশন করেন জনাব জাকির হোসেন ও তার দল। এরপর 'বাঙ্গালী সমাজে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অবদান ও প্রাপ্তি' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

জলসার চতুর্থ অধিবেশন শুরু হয় ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯-৩০ মি। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন, মৌলবী হাফেজ আবুল খায়ের। নযম পাঠ করেন শেখ মোস্তাফিজুর রহমান ও তার দল। বক্তৃতা পর্বে 'দোয়াই আমাদের অস্ত্র' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। এরপর 'কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ বাংলাদেশ। এরপর 'জার্মানীতে আহমদীয়াত' প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মোহতরম আব্দুল ওয়াগিস হাউজার, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, জার্মানী। এরপর বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব সিরাজুল ইসলাম ও তার দল। এরপর 'বাংলাদেশের সমাজ আমার দৃষ্টিতে অনুভবে' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম এ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান। এরপর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিবর্গ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। বিকাল ৩টায় বাংলাদেশের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি ও ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

জলসার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩-৩০মি.। সমাপ্তি অনুষ্ঠান পরিচালিত হয় লন্ডন থেকে। এতে সভাপতিত্ব করেন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহতরম মওলানা ফিরোজ আলম, ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক, লন্ডন। নযম পরিবেশন করেন জুবায়ের আহমদ। এরপর হুযূর (আই.) বাংলাদেশ জলসার সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন। হুযূর (আই.) এর দোয়ার মাধ্যমেই ৮৯তম সালানা জলসার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। এবারের জলসায় ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, মিশর, জর্ডান, ঘানা, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইটালী, জার্মানী, নরওয়ে, রাশিয়া, বেলজিয়াম, বাহরাইন, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশ হতে প্রবাসী বাঙ্গালীসহ মোট ৫৭ জন মেহমান অংশগ্রহণ করেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

[ডেস্ক রিপোর্ট]

সংবাদ

বিভিন্ন জামা'তে অত্যন্ত ভাবগম্ভীর্যপূর্ণ ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে পালিত হয় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা

আশকোনা

গত ২৫/০১/২০১৩ তারিখে আশকোনা হালকার স্থানীয় মসজিদ 'বায়তুল হুদা'তে বাদ জুমুআ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় মোট ১৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় সভাপতি ছিলেন, স্থানীয় হালকার প্রেসিডেন্ট জনাব সাবের আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন, মওলানা মোস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ। বক্তৃতা পেশ করেন স্থানীয় মজলিসের সেক্রেটারী তালীম ও তরবিয়ত জনাব মফিজুল ইসলাম স্বপন ও কায়েদ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া আশকোনা জনাব শমসের আলী সরকার। সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

ওয়াসিমুল কবির

তাহেরাবাদ

মজলিস আনসারুল্লাহ্ তাহেরাবাদ এর ব্যবস্থাপনায় গত ২৫/০১/২০১৩ তারিখ বাদ জুমুআ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়।

এতে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় মজলিসে কায়েদ, মোন্তাজেম উমুমী, মুন্তাজেম তালিম তরবিয়ত, স্থানীয় মোয়াল্লেম ও খাকসার। শেষে স্থানীয় প্রেসিডেন্টের বক্তব্য ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে উক্ত জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। জলসায় ৩৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ জিন্নাত আলী

নূরনগর

গত ২৭ জানুয়ারী ২০১৩, রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নূরনগর এর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসার আয়োজন করা হয়।

জলসার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোছা: আফসান আরা খাতুন (রিমা) এবং নযম পাঠ করেন লাজলি জামান (লিপি)। বক্তৃতা পর্বে পর্যায়ক্রমে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর আলোচনা করেন মোছা: মর্তজারা বেগম, মোছা: আফসান আরা খাতুন ও লাজলি জামান। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোছা: রওশান আরা বেগম

ফতুল্লা জামা'তে টিটি ক্লাস অনুষ্ঠিত

১৩ জানুয়ারী বাদ আসর জনাব গোলাম মোস্তফা ভাইস-প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে ক্লাসের উদ্বোধন করা হয়। এতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন জনাব সামসুদ্দিন আহমদ ও খাকসার। সভাপতির ভাষণের পর ইজতেমায়ী দোয়া হয়। তারপর ক্লাস চলতে থাকে।

উক্ত টিটি ক্লাসে শ্রেণী মোতাবেক সূরা যোহা, আসর ও ইখলাস মুখস্ত করানো হয়। চল্লিশটি মহামূল্যবান রত্ন হতে ৫, ১৩ ও ১৫নং হাদীস মুখস্ত করানো হয়। অযু, নামায, জুমুআ ও জানাযার নামাযের বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। ক্লাসে ১০ জন আতফাল অংশগ্রহণ করেন। ক্লাসের সহযোগী হিসেবে জনাব ফরিদ আহমদ ছিলেন।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

ফতুল্লা

গত ২৫ জানুয়ারী ২০১৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ অত্যন্ত জাঁকজমক ভাবে ফতুল্লা জামা'তে সিরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এ উপলক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সবাইকে দাওয়াত কার্ডের মাধ্যমে জলসার নিমন্ত্রণ জানানো হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব আবুল হাসেম বীর প্রতীক, প্রেসিডেন্ট, ফতুল্লা। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন যথাক্রমে এজাজ আহমদ ও মাসুদ আহমদ মামুন। তারপর জনাব কাজী মোবাশ্বের আহমদ 'আহমদীয়াতের ধর্ম বিশ্বাস' তুলে ধরেন। এরপর 'হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর রসূল প্রেম' এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন, মোয়াল্লেম। 'নবী করীম (সা.)-এর ক্ষমার অনুপম দৃষ্টান্তে'র ওপর আলোচনা করেন মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, মোবাশ্বের মুরব্বী। এরপর 'দোয়ার উৎকৃষ্ট নমুনা হযরত মুহাম্মদ (সা.)' বিষয়ে আলোচনা করেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান সুমন, মোবাশ্বের মুরব্বী। পরিশেষে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোয়া পরিচালনা করেন। জলসায় ৪৯ জন মেহমানসহ সর্বমোট ১৬১ জন উপস্থিত ছিলেন। আগত মেহমানদের অনুষ্ঠান শেষে হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা, ক্যাপিটল হিলে প্রদত্ত ভাষণ ও আহমদীয়াতের পরিচিতিমুলক লিফলেট দেওয়া হয়।

সামসুদ্দিন আহমদ

মিরপুর আহমদীয়া মসজিদের নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফজলে গত ১১/০২/২০১৩ তারিখ সোমবার বাদ আসর প্রস্তাবিত মিরপুর আহমদীয়া মসজিদের নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এবং ফলক উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও ফলক যৌথভাবে উন্মোচন করেন ৮৯তম সালানা জলসা উপলক্ষ্যে আগত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি ও অষ্ট্রেলিয়ার আমীর মোহতরম মাহমুদ আহমদ, বাংলাদেশ জামা'তের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশেরুর রহমান, এবং মিরপুর জামা'তের আমীর মোহতরম বি. আকরাম খান চৌধুরী। উক্ত মসজিদটি জি+৭ তলা বিশিষ্ট ভবন হবে যার আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে আট কোটি টাকা।

এই উপলক্ষ্যে একটি সংক্ষিপ্ত সীরাতুন নবী (সা.) অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয মৌলানা আবুল খায়ের এবং নযম পেশ করেন কাশেম হোসেন পিয়াশ। অনুষ্ঠানে জলসায় আগত প্রায় ৩০টি দেশের বিশিষ্ট আহমদী প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, জার্মানী, আমীর, কলিকাতা, জর্ডান জামা'তের প্রতিনিধি, মালয়েশিয়া জামা'তের মিশনারী ইনচার্জ, ঘানার প্রতিনিধি এবং পাকিস্তান থেকে আগত এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান, মৌলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন ও মৌলানা সুলতান মোহাম্মদ আনোয়ার সাহেব। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বঙ্গের আমীর, কানাডার আমীর, ঘানা ও নাইজেরিয়া জামা'তের প্রতিনিধি, আমেরিকার প্রতিনিধি, যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধি, মিশর ও জর্ডানের প্রতিনিধিসহ আফ্রিকান বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট আহমদী নেতৃবৃন্দ। বক্তাগণ বাংলাদেশে তাঁদের সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং এদেশের আহমদীদের আন্তরিকতা, সরলতা ও আতিথীপরায়ণতার প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মিরপুর জামা'তের আমীর মোহতরম বি. আকরাম খান চৌধুরী অতিথীদের স্বাগত জানিয়ে মিরপুর জামা'তের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন এবং কার্যক্রমের বর্ণনা দেন। অত:পর বাংলাদেশের নায়েবে আমীর মিশনারী ইনচার্জ মৌলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরীর উপস্থাপনায় প্রস্তাবিত নতুন মসজিদের নকশার উপর একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত অতিথীবৃন্দ এই নকশা প্রদর্শনী দেখেন এবং মসজিদের সফল নির্মাণের জন্য দোয়াসহ সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস ব্যক্ত করেন। কয়েকজন সম্মানিত মেহমান স্বত:স্ফূর্তভাবে মসজিদের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্য ইচছাও ব্যক্ত করেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

সংক্ষিপ্ত সীরাতুন নবী অনুষ্ঠানের উপর উপস্থিত সকলের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে লাজনাসহ প্রায় চারশতাধিক আহমদী উপস্থিত ছিলেন। সমবেত দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। সন্ধ্যায় মেহমানদের সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়।

প্রস্তাবিত এই মসজিদ নির্মিত হলে এটা হবে ঢাকার কেন্দ্রীয় মসজিদের পর আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মসজিদ। এই মসজিদের সফল নির্মাণের ও সর্বপ্রকার সফলতার জন্য বন্ধুদের খাস দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

শীতবস্ত্র বিতরণ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে এ বৎসর শীতবস্ত্র উত্তোলন ও বিতরণ করা হয়। মজলিসের উদ্যোগে আহমদী বাড়িগুলো হতে পুরনো ব্যবহার যোগ্য শীতবস্ত্র উত্তোলন করা এবং এই ফান্ডে অনুদান আদায় করা হয়। আদায়কৃত অনুদান কম্বল ক্রয় করে তা বিতরণ করা হয়। দরিদ্র আহমদী, অ-আহমদী, রেলস্টেশনে, ভিক্ষুকদের মাঝে ৪৩টি কম্বল, ১০০টি শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। তীব্র শীতে অত্র মজলিসের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস শীতার্থ মানুষের জন্য কিছুটা হলেও সহযোগী হয়েছে। মহান আল্লহ্ আমাদের মানব সেবায় আত্মনিয়োগের মনমানসিকতাকে বরকত মন্ডিত করুন, আমীন।

কায়েদ ম.খো.আ. ব্রাহ্মণবাড়িয়া

কৃতি ছাত্রী

আমার মেয়ে আমাতুল জামিল (ইফা) ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় (JSC) সরকারী অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে A^+ (জিপিএ ৫) পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। সকলের নিকট খাসভাবে দোয়ার দরখাস্ত করছি, আল্লাহ্ তাআলা যেন তার পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতেও সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ করে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষে পৌঁছে দেন।

মোহাম্মদ ইকবাল চৌধুরী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সিলেট

নাসেরাত দিবস অনুষ্ঠিত

গত ১৯/০১/২০১৩ তারিখ রোজ শনিবার মসজিদ কমপ্লেক্স নাসেরাত দিবসের আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আসিয়া জামান নোভা। দোয়া ও আহাদ পরিচালনা করেন সভানেত্রী। নযম পেশ করেন সুরাইয়া ইসলাম নদী। এরপর নাসেরাত বোনদের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল কুরআন তেলাওয়াত, নযম, রচনা ও আবৃত্তি। ৩-৩০ মিনিটে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সভানেত্রী। দোয়ার মাধ্যমে নাসেরাত দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

রোকসানা মঞ্জুর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রামের ৩২ তম সালানা জলসা ভাবগম্ভীয্যপূর্ণ ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে পালিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রাম এর সালানা জলসার সমাপ্তি অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন লন্ডন মসজিদের ইমাম মোহতরম মাওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব

মহান আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে গত ২২ ও ২৩ শে ফেব্রুয়ারি ১৩ রোজ শুক্র ও শনিবার চট্টগ্রামে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর উদ্যোগে বাইতুল বাসেত মসজিদ প্রাঙ্গনের বাহিরে খোলা জায়গায় ২ দিন ব্যাপি সালানা জলসা অত্যন্ত ভাবগম্ভীয্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক পরিবেশে সুশৃঙ্খল ও আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। বাদ জুমুআ দোয়া ও পবিত্র কুরআন তেলোওয়াতের মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শুরু হয়।

উল্লেখিত সালানা জলসার ১ম দিনে যুগ খলিফার সাহচর্য ও সম্পর্কের কল্যানের উপর নসিহত মূলক বক্তব্য এবং সমাপ্তি দিনের এতায়েতের বরকত ও কল্যানেই উন্নতির সোপানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন লন্ডন থেকে আগত লন্ডন মসজিদের ইমাম মোহতরম মওলানা আতউল মুজিব রাশেদ সাহেব, বিভিন্ন বিষয়ের উপর যথাক্রমে আরও বক্তব্য রাখেন, মোহতরম মোবাশশের উর রহমান ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, মোহতরম মওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, মোহতরম আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ, মোহতরম মওলানা মোহাম্মদ আবদুল মতিন মুরব্বী সিলসিলাহ এবং মোহতরম মীর মোবাশ্বে আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর। এছাড়া অনেক অ-আহমদী অতিথিবৃন্দ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন তাদের মাঝে, বিজ্ঞানী প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম মহানগর কল্যান পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াসসহ আরও অনেকে।

এই মহতী সালানা জালসার, শোকরানা জ্ঞাপন করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্জ নেছার আহমেদ। দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে। জলসায় চট্রগ্রাম জামাতের সদস্য ছাড়াও বিভিন্ন জামা'তের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। জলসার সংবাদ স্থানীয় কয়েকটি সংবাদ পত্রে ছবিসহ প্রকাশ হয় এবং স্থানীয় একটি টিভিতে জলসার খবর পরিবেশন করা হয়।

খালিদ আহমেদ সিরাজী
সেক্রেটারী ইশায়াত, চট্টগ্রাম

ওয়াকফে জাদীদের ২০১৩ সনের বাজেট প্রেরণ প্রসঙ্গে

প্রিয় ভ্রাতা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি খোদার ফজলে ভাল আছেন, আপনারা অবগত আছেন যে, হুযূর (আই.) ৪ঠা জানুয়ারী-২০১৩ জুমুআর খুতবায় ওয়াকফে জাদীদের ৫৬তম বৎসরের ঘোষণা দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। বর্তমান যুগের আহমদীগণের চাঁদা আদায় ও মালী কুরবানীর উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন ঘটনাবলীর বর্ণনা করেন এবং বর্তমান সময়ের মালী কুরবানীর কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে ওয়াকফে জাদীদের গত বৎসরের চাঁদা আদায় করেছে, যারা পূর্বের বৎসরের চেয়ে বেশি চাঁদা আদায় করেছেন তাদের জন্য সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করেছেন এবং তাদের রিজিকে যেন আল্লাহ্ অনেক অনেক বরকত দান করেন তার জন্য দোয়া করেছেন। হুযূর (আই.) সকল আহমদীকে ওয়াকফে জাদীদের নতুন বৎসরের ওয়াদায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন এবং জামা'তের কেউই যাতে এই চাঁদার ওয়াদার বাইরে না থাকেন।

সুতরাং আপনাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, আগামী ৩১শে মার্চ এর মধ্যে ২০১৩ সালের ওয়াকফে জাদীদের বাজেট তৈরী করে (নাম ও টাকার পরিমাণসহ) মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দপ্তরে পাঠাবেন। উল্লেখ্য যে, এপ্রিলের ১ম সপ্তাহের মধ্যে বাজেট সম্বলিত রিপোর্ট হুযূর (আই.) এর নিকট পাঠাতে হবে। পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রণয়নে স্থানীয় মুরুব্বী ও মোয়াল্লেমগণের এবং অঙ্গসংগঠনসমূহের সহযোগিতা কামনা করছি।

চাঁদার ওয়াদা যাতে পূর্বের চেয়ে বেশি করা হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলের হাফেয, নাসের ও হাদী হোন, আমীন।

শহীদুল ইসলাম বাবুল
সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ
মোবাইল : ০১৭১৪-০৮৫০৭০

بسم الله الرحمن الرحيم

এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও

মার্চ ২০১৩, এমটিএ বাংলা অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য অনুষ্ঠানসূচী (প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭:৩০ এর পর)

তারিখ	বিষয়বস্তু
০২/০৩/১৩ , শনি URDV 564 (পুণঃ)	শতবার্ষিকী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান ও কুরআন প্রদর্শনী
০৪/০৩/১৩, সোম URDV 560 (পুণঃ)	পুস্তক আলোচনাঃ "আহমদীয়াতের ইতিহাসে বাংলা স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব" এবারের ব্যক্তিত্বঃ জনাব সূফী মতিউর রহমান বাঙ্গালী, আলোচনায়ঃ প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী, জনাব যাফর আহমদ ও জনাব জাহাঙ্গীর বাবুল। ছোটদের ধর্মীয় জ্ঞানের অনুষ্ঠানঃ (পর্ব - ১) পরিচালনায় - প্রফেসর আমীর হোসেন ।
০৫/০৩/১৩, মঙ্গল URDV 565 (পুণঃ)	বাংলাদেশে আহমদীয়াতের শতবার্ষিকীতে বিভিন্ন দেশের শুভেচ্ছাবাণী
০৬/০৩/১৩, বুধ URDV 551 (পুণঃ)	বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানঃ "বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুগ খলিফার দিক নির্দেশনা" – অংশ গ্রহণেঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী ও আহমদ তবশির চৌধুরী।
০৯/০৩/১৩, শনি URDV 559 (পুণঃ)	তথ্যভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠানঃ মহানবীর (সাঃ) প্রতি অবমাননাকর চলচ্চিত্র নির্মাণের বিরুদ্ধে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিক্রিয়া। অংশগ্রহণেঃ মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ; উপস্থাপনায়ঃ আহমদ তবশির চৌধুরী ।
১১/০৩/১৩, সোম **URDV 563 (নতুন)**	বক্তৃতাঃ "মানবতার সুরক্ষায় মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শ এবং আমাদের করণীয়" - মোহাম্মদ খলিলুর রহমান; আলোচনাঃ 'ফিকাহ আহমদীয়া' থেকেঃ অংশগ্রহণে - মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান ও মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব জয়।
১২/০৩/১৩, মঙ্গল **URDV 566 (নতুন)**	আলোচনাঃ 'ফিকাহ আহমদীয়া' থেকেঃ অংশগ্রহণে - মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান ও মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব জয়; ছোটদের ধর্মীয় জ্ঞানের অনুষ্ঠানঃ (পর্ব - ৩) পরিচালনায়ঃ প্রফেসর আমির হোসেন।
১৩/০৩/১৩, বুধ **URDV 567 (নতুন)**	বক্তৃতাঃ "বাঙ্গালী সমাজঃ আমার দৃষ্টিতে ও অনুভবে" - মোহতরম এডভোকেট মুজিব উর রহমান (জলসা সালানা বাংলাদেশ ২০১৩)। নযমঃ সুলতান মাহমুদ আনওয়ার ও তার দল সাক্ষাতকারঃ "এমটিএ আল-আরাবিয়া এবং আরব বিশ্ব" - অংশগ্রহণেঃ ডাঃ হাতেম শাফী, আমীর, মিশর, জনাব গানেম আহমদ গানেম, আমীর, জর্ডান এবং জনাব তামিম আবুদাক্কা, আরবী ডেস্ক।
১৬/০৩/১৩, শনি **URDV 568 (নতুন)**	সাক্ষাতকারঃ "ঘানায় আহমদীয়াতের কার্যক্রম" - অংশগ্রহণেঃ জনাব আহমদ সোলায়মান এন্ডারসন ও মোহাম্মদ বিন ইব্রাহিম। শুভেচ্ছা বক্তব্যঃ ব্রাদার আতাউল ওয়াহিদ লাহাই, ক্যানাডা জামা'ত।
১৮/০৩/১৩, সোম **URDV 569 (নতুন)**	সাক্ষাতকারঃ "আমি কিভাবে আহমদী হলাম ?" - জনাব গানেম আহমদ গানেম, আমির, আহমদীয়া মুসলিম জামা 'ত, জর্ডান, ইংরেজী অনুবাদ জনাব তামিম আবুদাক্কা, সাক্ষাতকার গ্রহণে- আহমদ তবশির চৌধুরী। আরবী কাসিদাঃ মামুনুর রশিদ ও তার দল।
১৯/০৩/১৩, মঙ্গল **URDV 570 (নতুন)**	সাক্ষাতকারঃ মাওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব। সাক্ষাতকার গ্রহণে- আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব; শুভেচ্ছা বক্তব্যঃ ব্রাদার মুসা আসাদ, যুক্তরাষ্ট্র জামা'ত।
২০/০৩/১৩, বুধ URDV 563 (পুণঃ)	বক্তৃতাঃ "মানবতার সুরক্ষায় মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শ এবং আমাদের করণীয়" - মোহাম্মদ খলিলুর রহমান; আলোচনাঃ 'ফিকাহ আহমদীয়া' থেকেঃ অংশগ্রহণে - মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান ও মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব জয়।
২১ থেকে ২৭ মার্চ	সত্যের সন্ধানে, ২০ তম পর্বের পুণঃপ্রচার (৭ দিন)
২৮ থেকে ৩১ মার্চ	**সত্যের সন্ধানে, ২১ তম পর্ব (নতুন)** বৃহস্পতি, শনি ও রবিবারঃ প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে ১০ টা, শুক্রবার রাত ৮:৩০ থেকে রাত ১০:৩০

- *প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টায় (শীতকালীন সময় অনুযায়ী)- লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে যুগ খলিফার জুমুয়ার খুতবার সরাসরি সম্প্রচার এবং খুতবার পর কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান,*
- *প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ টায় — পূর্ববর্তী জুমুয়ার খুতবার পুণঃপ্রচার*
- *প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৭ টায় — কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান ।*
- *সত্যের সন্ধানে (২৯ তম পর্ব) পুণঃপ্রচারঃ ২৯,৩০,৩১ মার্চ ও ১ এপ্রিল, বাংলাদেশ সময় সকাল ১০ টায়।*

নিয়মিত এমটিএ দেখুন, নিজের ও পরিবারের হেফাজত করুন

প্রচারেঃ এমটিএ বাংলাদেশ স্টুডিও
যোগাযোগঃ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪, বকশি বাজার রোড, ঢাকা - ১২১১
Email: atabshir@hotmail.com **Web:** www.mta.tv; www.ahmadiyyabangla.org; www.alislam.org

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং
আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

New Vol. No. 75 | 16th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

28th February, 2013 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১

নীচ তলা

রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২

ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,

০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার

অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)

(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)

ধানমন্ডি, ঢাকা।

ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"

মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com